কাস্তে

অনিতা অগ্নিহোত্রী

॥ এক ॥

দুষ্কাল

মাঝরাতের পরই হবে তখন, তেরনার ঘুম ভেঙে গেল। ঠিক ঘুম ভাঙা বলে না একে। চোখের পাতা না খুলে শুয়ে থাকল তেরনা আর বাইরে কোথায় কী শব্দ হচ্ছে তা ধরার চেষ্টা করতে লাগল। তাদের আখ কাটাই টোলিতে মাটিতে পাতা বিছানায় টান টান হলেই শরীর ভেঙে পড়ে ক্লান্তিতে, অথচ ঘুম এখানে এত পাতলা, যে জাগা থেকে ঘুমে গড়িয়ে নামা; আবার ঘুম থেকে জাগায় সাঁতরে ওঠা, যেন ঘর থেকে উঠোনে পা ফেলার মতনই সহজ।

ছ'বছর হয়ে গেল, প্রথমে স্বামীর সঙ্গে তারপর ছেলেপুলে নিয়ে আখ কাটাই-এর টোলিতে আসছে তেরনা। বিয়ের পর থেকেই। মাঝখানে একটা বছর বর্ষা ভালো হয়েছিল। সে বছর গ্রামেই রয়ে গিয়েছিল, টোলিতে আসেনি ওরা। তাদের এলাকায় খরা শুরু হলে পর পর কয়েক বছর টানা চলতেই থাকে। ওরা বলে 'দুষ্কাল', চাষের খেতে জল নেই, গ্রামে মজদুরি নেই। তাদের বেরতেই হয় গ্রাম ছেড়ে। মারাঠওয়াড়ার ধাড় জেলা থেকে ট্রাক্টরে ট্র্যাকে ছ' থেকে আট ঘন্টার পথ সাতারা জেলার আখের খেত, চিনির কলগুলি। স্থানীয় ভাষায়, 'সাখর' কারখানা। শর্করা মানে চিনি। আর শর্করার অপভ্রংশ সাখর। চিনির কল মানে তাই সাখর কারখানা। খোলা দরজায় মুখে চিনির বস্তার সেলাই খোলা পলিথিন টাঙিয়েও হি হি করে কাঁপতে হয়। গরমে বাতাস ঢোকে না। দম আটকে বুকে পাথর চাপার কষ্ট।

এখন যেমন কষ্ট হচ্ছে তেরনার। মাথার ভিতর ঘুমের কিংবা ঘুমেরই মতন পাতলা একটা সর পড়ে থাকলে কষ্টটাও চাপা পড়ে যায় কিছুক্ষণ। এদিকে বাইরে চৈত্র মাস। কোকিল ডাকছে রাতের বুক চিরে। গাছ আর কটা এই মাঠে। অনেকগুলোই ন্যাড়া, বাজপড়া। ভিতরের দিকে কয়েকটা বড় আম, নিম দাঁড়িয়ে। কোকিল হয়তো তাদেরই ডালপালার ভিতর বসে ডাকছে। রাত এসে জুড়িয়ে দিয়েছে মাঠের বুক। পাহাড়গুলো সূর্য ডোবার পর তাদের শরীরের তাপ বাতাসে ছেড়ে দিয়ে শীতল হতে চেষ্টা করে। সহ্যাদ্রি পর্বতমালার নানা ঢেউ ছড়িয়ে আছে, কাছে-দূরে। কোনওটা দিগন্তের কাছ ঘেঁষে, কোনওটা হঠাৎ গ্রামের পিছনবাগে মাটি ফুঁড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। পাথর পুরো শীতল হবার আগেই সকাল হয়ে যায়। ভোরের সূর্য দিগন্ত ছাড়িয়ে উঠতে উঠতে তাপ ছড়ায়। আবার গরম হতে আরম্ভ করে পাথরের বুক।

চৈত্রের দিনগুলি তপ্ত। মাঝরাতের পর ততটা অসহ্য নয় তাপ। তেরনা জানে, এখন বাইরে গিয়ে দাঁড়ালে তাঁর শরীর কিছুটা জুড়বে। কিন্তু তবুও সে উঠবে না। এখানে টোলিতে বিশ্রামের কোনও ধরা-বাঁধা সময় নেই। কাজেই দিনে, রাতে যখনই ফাঁক পায় মেয়ে-মরদ সকলেই মাটিতে পাতা বিছানায় শুয়ে শিরদাঁড়া টান করে নেয়। কাজ অন্তহীন, তাই বিশ্রামেরও সময়ও বাঁধা নেই।

ঠাসাঠাসি আখের খেতে কাটাই-এর কাজ চলতে থাকে সারা দিন-রাত। গোড়া থেকে আখের কাণ্ডটা কেটে নিয়ে কাস্তে দিয়ে ডগার দিকটা আলাদা করে নেওয়া। কাটা আখের বোঝা ট্রাক্টরে লাগাবার জন্য আরও দু'জন দাঁড়িয়ে। দুই খেতের মাঝখানের পথে ট্রাক্টর দাঁড়িয়ে থাকবে, যতক্ষণ না বোঝাই হয়। তারপর বোঝাই ট্রাক চলে যাবে চিনিকলে। কারখানা গেটে লম্বা লইন লেগেই আছে। চারদিকেই তো আখের খেত। খেত থেকে বোঝাই ট্রাক্টর ধেয়ে আসছে অনবরত। সিকিউরিটি গার্ডদের বাঁধা রোট দিলে আগে ঢোকার ব্যবস্থাও হয়ে যায়। গাড়ি খালি হয়ে ফেরার পথ ধরলেই আবার কাটাই-এর কাজের সময় হয়ে যায়। গাড়ি যে কোনও সময় ফিরতে পারে, ভোর তিনটেয়, সকাল সাতটায়। তার মধ্যে পালা করে ঝুপড়িতে ঢুকে হাত পা টানটান করে নেওয়া।

চরাচরে এখন তেমন কোনও শব্দ নেই, রাতপাখির ডাক, কোকিলের মনস্তাপ ছাড়া। মাটিতে পড়ে থাকা আখের পাতার উপর দিয়ে হয়তো হেঁটে গেল কুকুর। খস খস খস্। বলদের গলার ঘণ্টা বেজে উঠল টং... টং...। তেরনার ঘুম কিন্তু এইসব কোনও শব্দে ভাঙেনি। ভেঙেছে অন্য কারণে। আখ কাটাই-এর টেলিতে রাত কাটানোর সময় যুবতী মেয়েমানুষের মনে সব সময় যে ভয় বিদ্যুতের মতো এঁকেবেঁকে খেলা করে যেতে থাকে, সেই ভয়ে। যদি কেউ তোমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। তুমি চোখ বন্ধ করেও বুঝতে পারো। ঘুমের আঠা জড়িয়ে নেই চোখে, কিন্তু দু'চোখ জ্বালা করে আসে খোলার সময়। আপনা থেকেই অভ্যেসে এক হাত পাশে বুলিয়ে তেরনা দেখে নেয়, বাচ্চা দুটো তাকে ঘেঁষেই আছে তো? মোটা চাদরের উপর ন্যাকড়াফালি পেতে দু'টোকে শুইয়েছে। তারা গভীর ঘুমে তলিয়ে আছে এ ওর উপর হাত-পা মেলে। অন্য হাতটা বুকের উপর তুলে আনল তেরনা। নিজেদের বাড়িতে খোলামেলা পোশাকে ঘুমানো যায়, ঘরের ভিতর। টেলিতে তা চলে না। রাতের বেলা, যে কোনও সময় কাটাই-এর ডাক আসতে পারে। কাজের সময় পায়ে থাকে ঢাকা কাপড়ের জুতো। পাথর হট্টি কাচ কত কী থাকে টেলিতে। পরনে থাকা প্যান্ট-হাতা মোটা কাপড়ের শার্ট, বোতাম লাগানো। নীচে পাজামা, তার উপর আরও একটা ঢোলা প্যান্ট। কাস্তে নিয়ে খেতের ভিতর ঢুকলে আগাছার কাঁটা, আখের গাঁট কত কিছুতে ছড়ে যেতে পারে গা-বুক। রাতের খাওয়ার পরও সেই পোশাক খোলে না তেরনা। শরীর ভ্যাপসা গরমে ছটফটাতে থাকে হাওয়া না ঢোকা ঝুপড়ির ভিতর। তবুও একটিও বোতাম খোলে না সে। যে কোনও সময় উঠে কাজে যেতে হতে পারে, দেরি হয়ে যাবে, কেবল সেই জন্য নয়। এই পোশাক তার আত্মরক্ষার বর্মও বটে। টানাটানি করে খোলা যাবে না, আঁট বোতামগুলো সময় নেবে। ততক্ষণে চিমটি কেটে বাচ্চাদের উঠিয়ে দেওয়া যাবে।

বিয়ের পরের বছর নতুন টেলিতে এসে নিজের ভুলেই বিপদ ডেকে এনেছিল সে। টেলির দরজা নেই, আঁধারে ঢুকে আসতে পারে বিড়াল, কুকুর, মানুষ। কুকুর, বিড়াল আঢাকা খাবার খোঁজে। মানুষের খোঁজ অন্যরকম। সেই একবারই ভুল হয়েছিল তেরনার। বাড়িতে যেমন করে, আলুথালু ঢিলে পোশাকে শুয়েছিল। আগের দিন বিকেলে আচমকা আঁধি এসে জড়িয়ে দিয়েছিল বাতাস। চমরু তখন আখের খেতে, নতুন বউকে বলেছে, তুমি একটু ঝুপড়িতে জিরিয়ে নাও। ভোরের দিকে উঠাব। সেই ঘুমই কাল হল তেরনার। শরীরের ওপর আস্ত একটা মানুষ। মদের গন্ধে দম বন্ধ হয়ে আসে। ধড়ফড়িয়ে উঠল তেরনা। না, না, এ তার বর নয়। এ হল মুকাদমা। চিনি কলের দালাল যে আগাম মজুরি দিয়ে তাদের মতন আখ কাটাই মজদুরদের টেলিতে এনে ফেলেছে। টেলির সহবত জানা ছিল না, তাই হাউমাউ করে উঠেছিল তেরনা। সঙ্গে সঙ্গে থাপ্পড় এসে পড়েছে তার কোমল মুখের ওপর, থেঁতলে রক্তাক্ত হয়েছে ঠোঁট। হিস্ হিস্ করে উঠেছে লোকটা। একদম মুখ খুলবি না। গলা টিপে রেখে যাব, শালি। কয়েক মিনিটের তো ব্যাপার। টেলির ভিতর কতই বা অবসর। মুকাদমও জানে। মরদ চুকে আসতে পারে, চলে আসতে পারে আশপাশের ঝুপড়ির মেয়ে-পুরুষ। হাতেনাতে ধরা পড়ে যাওয়া মুকাদমের ইজ্জতের সঙ্গে খাপ খায় না, যদিও ধরা পড়ে গেলেও তাকে নিয়ে থানায় এত্তেলা দিতে যাবে, এমন মুঙ্গু কার ধড়ে আছে? সে না আগাম দিলে তো টানা আট মাস উপোস মজদুরের, তেরনার তেজালো শরীরটা যার মধ্যে ঢুকে ঘুমিয়ে আছে সাতপুরু কালো মাটি আর আখপাতার ঘ্রাণ, তার মধ্যে নিজেকে কাস্তের মতো চালিয়ে দিতে যেটুকু সময়। জামাকাপড়গুলো খিল্লানর ওপর ফেলে দিয়ে নিজেকে ঝেড়েঝুড়ে বেরিয়ে গিয়েছিল লোকটা। আর, নিজেকে ঢেকে নিয়ে বসে থেকে একসময় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিল তেরনা। তেমন কান্নার শব্দে রাত খান খান হয় না। ভোরের দিকে চমরু এসে বউকে দেখে সব বুঝেছিল। সান্ত্বনা দেয়নি, চোখের জলও মোছায়নি। কিন্তু মারেওনি। সেই তো বউকে বলেছিল টেলিতে গিয়ে শুয়ে থাক, একটু আরাম হবে। ভাগ্যিস তখদিনে তেরনার পেটে এসে গেছে তাদের প্রথম সন্তান। চমরুও জানে। বাচ্চটা জন্মাতে মাস তিনেক। তার বছর না ঘুরতেই দ্বিতীয়টা পেটে এসে গেল। সে বছর বর্ষা ভালো হয়েছিল, বাচ্চটার পয় আছে। ছেলের পর মেয়ে। তেরনা আর তার বর গ্রামে কাটিয়েছিল পুরো মরশুম। কিন্তু পরের বছর থেকে ওরা আবার আসছে, আসতেই হচ্ছে। তেরনা এখন পোক্ত হয়েছে। নিজেকে পুরো মুড়েসুড়ে ঘুমোতে যেতে তার ভুল হয় না। ভুল করে না বাচ্চা দুটো নিজের কাছ ঘেঁষে শোওয়ানোর নকশায়।

দ্বিতীয় বাচ্চটা ছ'মাসের না হতেই জেলার ক্লিনিকে গিয়ে বাচ্চাদানি ফেলিয়ে আসতে হয়েছে তেরানকে। মারাঠওয়াড়ার দুষ্কাল ঘুচবে না। দুষ্কাল বহাল রাখতে অনেক টাকা খাটছে সরকারের অন্য মানুষদের। যেখানে পুঁজি খাটে, সেখানে বড়লোকদের মুনাফা। আখ টেলিতে তাদের আসতেই হবে বছরের পর বছর। নালীতে সেলাই দিয়ে বন্ধ করা কাঁচা ব্যবস্থা, ওতে অনেক সময় কাজও হয় না, তাছাড়া প্রতি মাসের 'বারি'র সমস্যা। এখানে না আছে স্নানের ব্যবস্থা, না শৌচাগার। আট মাস মেয়েরা যায় কোথায়? তাই এই পাকাপোক্ত ব্যবস্থা। বাচ্চাদানিও নেই তেই ঝুট-ঝামেলা খতম। তার মরদই এক রাতে বলেছিল তেরনাকে, হিস হিস করেই, তবে চড়-থাপ্পড় না মেরে টেলির ঝোপড়াতে শেয়াল, কুকুর অনেক আসবে। তুই তকলিফ লিবি না মজা লুঠবি, সেটা তোর ব্যাপার। কিন্তু কোনও বাচ্চা যদি সঙ্গে আনিস, লাথি মেরে তাড়িয়ে দেব বাড়ি থেকে। সেসব কয়েক বছর আগেকার কথা। দুষ্কাল চলছে একটানা, পর পর তিন বছর। তারা আবার আসতে লেগেছে টেলিতে। মজবুরি বেড়েছে তেরনাদের। শেয়াল-কুকুরদের খিদে, সেও কি আর কমে? সজাগ থাকতে হয়। আখপাতার বিছানার উপর তাই চোখ খুলে বাইরের অন্ধকার সইয়ে নেয় তেরনা। ওঠে না। মানুষ গন্ধ পেয়েছে সে। কাঁচা তামাক আর মদের গন্ধ বয়ে আসে বাতাসে। বিড়ির জ্বলন্ত চোখ দেখা যাচ্ছে মাথা একটু তুললেই।

একজন নয়। দু'পেয়ে শিয়াল দুটো। একজন ঢুকে আসবে চুপচাপ। অন্যজন পাহারায় থাকবে বাইরে। বাচ্চাদানি উপড়ে নেওয়া হয়েছে। তেরনার তাই সাহস গলাটা রীতিমতো ভারী করে সে চেঁচিয়ে ওঠে— কে রে— কে ওখানে? চোর নাকি? এক হাতে ছোট বাচ্চাটাকে রামচিমটি দেয়, সে ঘুমের ঘোরে চিৎকার করে কেঁদে ওঠে। বিড়ির আগুন, পায়ের খস্‌খস্ সতর্কভাবে সরে যায়। তেরনা উঠে বসে, তার বুকে গলায় ঘাম জমতে লেগেছে। লোকদুটো হয়তো যায়নি, হয়তো ধারেকাছেই

আছে! ছোট মেয়েটাই তার ঢাল এখন। তার বাছতে আরও একটা চিমটি দিয়ে তাকে কোলে করে বাইরে চলে আসে তেরনা। কাঁদ ব্যাটা, ভালো করে কাঁদ। শোরগোল তুলে দে। বলদদের বিমানো ভেঙে যায় অতর্কিত চিৎকারে, তাদের ঘণ্টা দোলে, গলা থেকে ঘুম ভাঙা আওয়াজ বেরয় বাঁ-আঁ-আঁ—

যেন অন্ধকারেই সূর্য উঠতে চলেছে আখমাড়াই টোলিতে। লোক দুটো দ্রুত চলে যায় দু'সারি ঝুপড়ির মাঝখানের পথ বেয়ে। বেশ দূরে সদর সড়কের ধারে দাঁড় করানো তাদের মোটরবাইক। বাইক স্টার্ট করার মৃদু আওয়াজ পাওয়া যায় এখান থেকে। তেরনা বোঝে এবারের মতো কাজ করেছে তার তরিকা। সামনে একটু তফাতে যুবক মগন মালে শুয়েছিল চারপাই-এর উপর। ঝুপড়ির ভিতর ভ্যাপসা গরম বলে পুরুষদের এ বিলাসটুকু আছে। শোরগোলে ঘুম ভেঙে উঠে বসে অন্ধকারে সে দেখতে পায় তেরনা মেয়ে কোলে দাঁড়িয়ে। কাছে এসে জিজ্ঞাসা করে, কী হয়েছে বহিনী (ভোন) কে এসেছিল?

তেরনা কাঁপা গলায় বলে— চোর! এই দরজার সামনে দাঁড়িয়েছিল। ধিড় খাচ্ছিল!

ভিতরে ঢোকেনি তো? মগন নিশ্চিন্ত হয়, বলদগুলো ঠিকঠাক আছে তোমাদের।

ভালো 'খিলার' বলদ, সুস্থ সবল। বিশাল বাঁকা শিং গাঢ় কমলা রঙে রাঙানো। গবাদি পশু চোরেদেরও আলাদা দল বা মুণ্ড আছে। এই কাটাই-এর মরশুমে বলদ গাড়ি সবকিছুর জোগানে টান পড়ছে, চোরেদের দল ঘুরছে।

যুবক মগন এখানকার হাল হকিকত জানে। সে বুঝেছে এটা চোরের দলের নয়। মোটরবাইক হাঁকিয়ে যারা আসে, তারা অন্য গোত্রের। ডাকাত। সে জানে, কত বিধবা স্বামীবিচ্ছিন্না মুকাদম ও তার লোকজনেদের নিয়মিত শিকার। অবস্থার সামনে নিজেদের সঁপে দেওয়া ছাড়া তাদের পথ নেই। মগন বলে, আমি সজাগ থাকব। তুমি যাও বহিনী। ঘুমিয়ে লাও। ওরা আজ আর আসবে না। অন্তত বাকি রাতটায়। মগন তা বোঝে, তেরনাও জানে।

এবার নিশ্চিন্ত হয়ে শার্টের বোতাম আর প্যান্টের রশি ঢিলা করে সে হাত পা ছড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়ে আখপাতার বিছানায়। আর সত্যি সত্যি ঘুমও এসে যায় তার।

প্রতি বছর ওরা দেশান্তরে চলে। ফসল কাটা শেষ, শীত এসে গেছে, সামনে দীর্ঘ বৃষ্টিহীন, সেচহীন, নিষ্ফলা মরশুম, আগামী বর্ষণ বহুদূরে। তখন নিরন্ন দিনযাপনের সম্ভাবনাকে ঠেকিয়ে রাখার বিপুল চেষ্টায়, তারা মারাঠওয়াড়ার মেঘচ্ছন্ন অঞ্চল থেকে বার হয়ে দলে দলে, বলদগাড়িতে ট্রাক্টরে অথবা ট্রাকে চেপে আসে পশ্চিম মহারাষ্ট্রের সুজলা সুফলা দুধ ও চিনির মৃত্তিকায়। সম্মিহিত কর্ণাটকেও যায় অনেকে। কিন্তু অধিকাংশই আসে রাজ্যের ভিতর অন্য এক জেলাই, আখ কাটাই-এর জন্যে। স্থানীয় মজদুর এ ফসল ছোঁবে না, কারণ কম মজদুরির রেট তাদের পোষাবে না। তাই আখের চাষ করে সাতারা, সাংগলি, পুনে জেলা আর মজদুর পাঠায় মারাঠওয়াড়া। ছিটিয়ে-ছড়িয়ে আছে কয়েকশো চিনিকল। তাদের জোগান দিতে আখ লাগায় চাষি। চাষির ফলানো আখ কিনে নিতে হয় চিনিকলগুলিকেই। কাটাই মজদুর আনার দায় তাই চাষির নয়। কাটাই-এর মরশুমের আগে চিনিকলগুলি বরাত দেয় স্থানীয় মুকাদম বা গ্রামীণ ঠিকেদারদের। তারাই দাদন দিয়ে আগাম সময় কিনে নেয় আখ কাটাই মজদুরদের। কাস্তে পিছা রেট। স্বামী-স্ত্রী মিলে এক 'কইতা' বা কাস্তে। কইতা হল আখ কাটার কাস্তে বা ছুরি। যদি নিজেদের বলদ গাড়ি থাকে পরিবারের যা কাজে আসবে আখ বওয়ায়। অথবা যদি থাকে ট্রাক্টর, তাহলে আরও ভালো। তার রেট বেশি। অনেকেই আসে কেবল কাস্তে সম্বল করে, তাদের বলদ ও গাড়ি জোগায় চাষি। কার্তিকের শেষে, অগ্রহায়ণের প্রথমে বর্ষার ফসল ঘরে তোলা হয়ে গেলে কাটাই মজদুররা দলে দলে গ্রাম ছেড়ে দেশান্তরে রওনা দেয়। তারা আবার নিজের ঘরে ফিরবে বর্ষার আগে। ছ'মাস কেবল ভাগ করা তাদের গৃহস্থালি। বর্ষা থেকে শীতের গোড়া পর্যন্ত নিজেদের গ্রামে। শীত থেকে আরম্ভ করে বর্ষার আগে পর্যন্ত কাটে আখ কাটাই-এর টোলিতে। সে বড় অদ্ভুত জীবনযাপন। খোলা আকাশের নীচে বাঁশ-কঞ্চির ওপর আখের পাতা ছাওয়া তাঁবুর মতন হাঁ করে ঘর। কারখানার কাছের ফাঁকা মাঠের টোলিগুলি যেন যাযাবরদের তাঁবু। তিনশো কি চারশো ঝুপড়ি ঘরের জন্য একটি বা দুটি কলের জল। আখ কাটাই-এর কাজের ফাঁকে ফাঁকে সে জল ভরতে মেয়েদের বেলা যায়। ঝুপড়িগুলি বিদ্যুৎবিহীন। যদি নেহাৎ দয়াবান হয় চিনির কল, যাকে স্থানীয় মানুষ বলে সাখর-কারখানা (সাখর=শর্করা=চিনি), তাহলে উঁচু একখানা বাতিস্তম্ভ থাকতেও পারে টোলির মাঠে, তার আলো সর্বত্র যে পৌঁছয় না তা বলাই বাহুল্য।

পানীয় জল, বাতিস্তম্ভ এসব এখনও বিলাস বহু কাটাই টোলিতে। যাদের নিজেদের বলদগাড়ি নেই, সেই সব ভূমিহীন মজদুরদের ছোট ছোট টোলি গড়ে ওঠে আখের খেতের ধারেকাছে অথবা কারখানার জমিতেই। ঝুপড়িকুঁড়ি থাকে শুধু খোলা আকাশের নীচে, আর কিছুই না। সূর্য ডোবার পর টোলিতে নেমে আসে অন্ধকার। ওই অন্ধকারে পাতার জ্বালে রান্না। জ্বালানিও পাতার, ঘরও পাতার। আগুন লেগে পুড়ে ছাই হয়ে যেতে পারে গৃহস্থালী, জেনেও মেয়ে-বউরা নিশ্চিন্ত মনে বঁটি পেতে শাকসব্জি কেটে নেয় বিকেলের মুখে। নিজেদের গ্রামে দু'বার রান্না হতো— সকাল-বিকেল। এখানে বিকেলের রান্নাটেই চালিয়ে নিতে হয় সকাল-দুপুর। মেয়েদেরও দু'বার রাঁধার সময় কোথায়? সকালের সূর্য ওঠার পরপরই মেয়েপুরুষ সবাইকে ছুটতে হয় আখ কাটাই-এর কাজে, দুপুর একটার সময় খেতের ধার-কাছে বসেই দুটো খেয়ে নেওয়া। আগের বিকেলে গড়া জোয়ারের ভাকরি, শাক, আচার। তারপর আবার কাজ। মেয়েরা সন্ধের মুখে খেত থেকে ঘরে ফিরে আসে— যেহেতু তাদের আছে জল ভরণের কাজ, জ্বালানি আনা, রান্না, বলদদের খাবার দেওয়া, বাচ্চাগুলিকে সাফ-সুতরো করা। তাই ওইটুকু সময় তারা টোলিতে কাটায়— তাও বিশ্রামে নয়, কাজের জন্যই। খাওয়া-দাওয়া বাসন মাজার পর এখানে রাতের ঘুম নয়, আবার আখের খেতে যাওয়া, কাটাই-এর জন্য। কারখানা থেকে আখ খালাস করে খালি হয়ে ফিরে আসছে যে ট্রাক্টর অথবা বলদগাড়ি, তাতে চড়েই আবার রাতের খেতে। এ এক অদ্ভুত শ্রম, যার চক্রে বিরতি বলে কোনও আইনি বাস্তবতা নেই। এরা সব দাদন শ্রমিক, মরশুমের টাকা নিয়ে নিয়েছে আগেভাগেই, কাজেই যতক্ষণ শ্বাস বায়ু চলে ততঘণ্টা এরা কাজ করতে বাধ্য। যেটুকু বিরতি, তা শুধু কারখানায় গাড়ি খালাসের পর্টুকুতে। তাও সবার নয়। পালা করে বিশ্রাম নিতে হয় মজদুরদের। মেয়েরা যখন টোলিতে হাত-পা ছড়িয়ে নিচ্ছে, পুরুষরা তখন খেতে। আবার একদল খেতে যাবে, অন্যদল ফিরে আসবে কিছুটা বিশ্রামের জন্য।

মানুষ এখানে কাস্তে। তাদের নাম নেই, সংখ্যা আছে। পরিবার পিছু কাস্তের হিসাব। স্বামী-স্ত্রী মিলে এক। সঙ্গে প্রাপ্তবয়স্ক সন্তান বা দেবর থাকলে তাদেরও ধরা হবে কাস্তের হিসাবে। যে টাকা আগাম নেওয়া হয়েছে, তার উপযুক্ত পরিমাণ আখ কেটে বোঝাই করে তবেই কাস্তের মুক্তি। শ্রমিককে মানুষ ভাবলে কুড়ি থেকে বাইশ ঘণ্টা কাজ তাদের দিয়ে করানো সম্ভব হত না।

যারা কাটাই-এর কাজে আসে, তারা সকলে কিন্তু ভূমিহীন মজদুর নয়। অনেকেরই জমি আছে। কারওর দুই, কারওর পাঁচ,

কারও বা দশ একর জমি। এ সবই পাটিগণিতের সংখ্যা, বৃষ্টিহীন, সেচহীন মারাঠওয়াড়ায় এর কোনও তাৎপর্য নেই। যে খেত খরিফ চাষে না পায় বৃষ্টি জল, না রবির মরশুমে সেচের জন্য — সে জমি ধু ধু পড়ে থাকে। জমি মালিকের কোনও সুরাহা হয় না তাতে। তাকে ঘরকন্না গুটিয়ে স্ত্রী- সন্তানের হাত ধরে আসতেই হয় মারাঠওয়াড়া ছেড়ে। উপর্যুপরি খরা বা দুক্কাল চলতে থাকলে কেবল নিজেদের নয়, পোষা গোরু-বলদগুলিরও খাবার জোগানো মুশকিল হয়ে পড়ে। এক ফসলের ফলন দিয়ে সারা বছর চালানো এমনিতেই কঠিন, তার ওপর যদি বর্ষার অভাবে সে ফসলও না হয়, তাহলে চাষির সামনে পড়ে থাকে কেবল অন্নহীন ভবিষ্যৎ। আওরঙ্গাবাদ, বিড, হিঙ্গোলি, জাল্‌না, লাতুর, লানদেড়, ওসমানাবাদ, পরভনি— আটটা জেলা জুড়ে মারাঠওয়াড়া অঞ্চল। সোজা কথায়— মারাঠাদের 'ওয়াড়া' বা বাসভূমি। নামের একটা তাৎপর্য আছে অবশ্য। এই অঞ্চল নিজামের আমলে ছিল হায়দরাবাদ রাজ্যের মধ্যে। দু'শো বছর আগেও এখানকার মারাঠিভাষীরা নিজেদের মারাঠওয়াড়ার অধিবাসী বলে জানত। স্বাধীনতার কিছু পরেই, ১৯৪৯ সালে হায়দরাবাদ রাজ্য ভারতের অংশ হয়ে যায়। অন্ধ্রপ্রদেশের জন্ম অবশ্য আরও পরে, ১৯৫৬ সালে। পুরো আওরঙ্গাবাদ ডিভিশনটাই সাবেক মারাঠওয়াড়া অঞ্চল। এর দক্ষিণে ও পশ্চিমে এখন কর্ণাটক ও তেলেঙ্গানা রাজ্য, পূর্বে মহারাষ্ট্রের বিদর্ভ অঞ্চল ও পশ্চিমে খান্দেশ। পঁয়ষট্টি হাজার বর্গ কিলোমিটারের বিস্তার, দু-কোটি মানুষের বাস। ম্যাপে মারাঠওয়াড়ার জেলাগুলিকে একসঙ্গে দেখলে মনে হয় উদ্বিগ্ন কোনও পশু যেন উদ্‌প্রীব হয়ে তাকিয়ে বসে আছে।

সত্যিই মারাঠওয়াড়াকে উদ্‌প্রীব, আতুর করে রাখে তার বিচিত্র ভৌগোলিক অবস্থান, বিলম্বিত বর্ষা, স্বল্প বর্ষা, খরা, দুক্কাল— এই তার নিয়তির নানা রকমফের। একে তো মহারাষ্ট্র এক বিশাল রাজ্য, পশ্চিমকূলে আরব সমুদ্র থেকে পূর্বে মধ্যভারত পর্যন্ত তার বিস্তৃতি, উত্তরে মধ্যপ্রদেশ থেকে দক্ষিণে কর্ণাটক পর্যন্ত মহারাষ্ট্রের বিস্তার।

তার ভিতর মারাঠওয়াড়া অঞ্চলটি একেবারেই অন্তর্ভাগে। বৃষ্টি এখানে পৌঁছতে পৌঁছতে ক্ষীণ ও প্রায় লুপ্ত হয়ে যায়। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর উদ্‌গম হয় বঙ্গোপসাগরে, দেশের অভ্যন্তরে পৌঁছে বৃষ্টি দিতে দিতে সে বাতাসের প্রভাব থাকে মধ্যভারত ও সন্নিহিত বিদর্ভ অঞ্চল পর্যন্ত। মহারাষ্ট্রের বিদর্ভ কিছু বেশি বৃষ্টি পায়। কারণ এ অঞ্চল মধ্যপ্রদেশ সংলগ্ন। অথচ বিদর্ভের পশ্চিমে মারাঠওয়াড়ার ভিতর পৌঁছয় না দক্ষিণ-পশ্চিমা বাতাস। আবার পশ্চিমকূলে আরবসমুদ্রে যে মৌসুমি বায়ুর উদ্ভব, গোয়া ও কোঙ্কণ উপকূলে বৃষ্টি দেওয়ার পর পশ্চিমঘাট পর্বতমালায় বাধাপ্রাপ্ত হয়ে সে বৃষ্টি দেয় পুনে ও সাতারা জেলায়। দুধ ও শর্করায় সম্পন্ন এ দুই জেলা। এ বৃষ্টিও শেষ হয়ে যায় মারাঠওয়াড়ায় পৌঁছনোর আগে। সাতারা থেকে বিড়ের মধ্যে পঞ্চাশ কিলোমিটার পথ দৈর্ঘ্যের ভিতর বদলে যায় বৃষ্টির ঘনত্ব। বছরে আড়াইশো সেন্টিমিটার বৃষ্টি অঞ্চলের খুব কাছেই থাকে পঞ্চাশ থেকে একশো পঁয়ত্রিশ সেমি বৃষ্টিপাত সমন্বিত ভূমি। এ রাজ্যের কৃষির ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে বড় ঠিকাদারদের সংগঠিত চক্র। তারা চায় বড় বাঁধ। বড় বাঁধে শ্রমের চেয়ে অনেক বেশি প্রয়োজন হয় মূলধন। সিমেন্ট, লোহা, বালি, পাথর। এগুলির জোগানের থাকে সংগঠিত অর্থনীতি, রাজনীতি। লাতুরের যে বড় বাঁধটি তেরো কোটি টাকার মঞ্জুরিতে আরম্ভ হয়েছিল, কাজ শেষ হওয়ার আগে তার এস্টিমেট সাতশো গুণ বেড়ে দাঁড়ায় নব্বই কোটিতে। সোলাপুরের ভীমা বাঁধ প্রকল্পে খরচ বৃদ্ধি হয়েছে ৭০০০ গুণ— একক্ষিপ্ত কোটি টাকার প্রকল্প শেষ হয়েছে দু'হাজার কোটি টাকার খরচ ছাড়িয়ে। এর মানে কী? বাঁধের জন্য বাঁধ— এই যখন হয়ে দাঁড়ায় দস্তুর। তখন খরচের অঙ্কগুলি কালির ফোঁটা ছাড়া আর কিছুই নয়। সত্তরভাগ টাকা যায় ঠিকাদারের হাতে, রাজনীতির লোকেরা পায় দশ ভাগ, কুড়ি ভাগ টাকায় আর যা হোক সেচের কাজ হয় না। যেসব রাজ্যে সেচের জমির পরিমাণ বেশি, তারা এত বড় বাঁধ তৈরি করে জনগণের অর্থ নষ্ট করে না। দশ থেকে পনেরো মিটার কী তারও বেশি উচ্চতা এক একটি বড় বাঁধের। ৬ কোটি ঘন মিটার জল ধরার কথা গড়ে।

কিন্তু কই? বড় বাঁধগুলির কোনওটি অসম্পূর্ণ, কোনওটায় ক্যানাল সিস্টেম তৈরি হয়নি। তাদের জলে যা সেচ হয় তা নগণ্য। বৃষ্টিপাত স্বল্প হলেও চাষ যথেষ্ট হতো যদি নষ্ট না হতো বৃক্ষরাজি, যদি পুনর্জীবিত করা যেত ভূগর্ভস্থ জলকে, যদি ছোট ছোট বাঁধ দিয়ে প্রবহমান জলকে ধরে রাখা যেত। এমন সব ছোট বাঁধ বা আনিকাট প্রকল্পের খরচ আড়াই থেকে কুড়ি লাখ টাকা। এত ছোট কাজে রাজনীতিক-আমলা-ইঞ্জিনিয়ার-ঠিকেদারদের কোনও আগ্রহ নেই। কাজেই ও প্রসঙ্গ নিয়ে কোনও কথা হয় না।

মহারাষ্ট্রের সহ্যাদ্রি পর্বতমালার দেহে যে বিপুল বৃষ্টি ঝরে পড়ে, তার অধিকাংশই বয়ে যায় সমুদ্রজলে। আবার ডেকান মালভূমির উপরিস্থিত অঞ্চল বলে, জল এখানে ভূতল থেকে টেনে বার করতে হয়, তার নিষ্কাশন খরচ অনেক বেশি। এই দুই প্রাকৃতিক অনুৎপাদক ব্যয়ের সঙ্গে জুড়ে যায় ঠিকেদারদের বিরাট প্রভাব এবং সরকারি টাকা টেনে নিয়ে বড় বাঁধে নিমজ্জিত করে দেওয়ার চক্র। ছোট চাষি, মাঝারি চাষি এই রাজনীতি জানে— কিন্তু তারা আর কী করবে? মেঘহীন, সেচহীন অঞ্চলের চাষের চেষ্টা।

পরভনি, বিড, লাতুর, খান্দেশ জেলাগুলি বৃষ্টিহীন আকাশের দিকে তাকিয়ে বসে থাকে এবং নিজেদের মন্দ বৃষ্টিভাগ্যকে দোষ দেয়।

মারাঠওয়াড়ার ভৌগোলিক অবস্থান তো বদলায়নি। অথচ দেড়শো দু'শো বছর আগে নিজামের আগেও এখানকার ভূমি দু'ফসলি ছিল অনেক জায়গাতেই রাজস্থানের চেয়ে বৃষ্টি বেশি পায় মারাঠওয়াড়া অথচ তার চাষের পদ্ধতিতেই রয়ে গেছে গলদ। ভূগর্ভস্থ জল টেনে নেওয়াতে সাধির যত আগ্রহ, এ জলকে পুনঃসিঞ্চিত করার কোনও ব্যক্তিস্বার্থ নেই। চাষি তার লাভ লোকসান দেখবে, মাটির নীচেকার জলের তর কত নামল এ নিয়ে তার ক্ষেত্রেও মাথাব্যথা নেই। জলস্তর নেমে গেছে এ অঞ্চলে, একই সঙ্গে হ্রাস পেয়েছে হরিৎ আচ্ছাদন ভূমির এক তৃতীয়াংশে বৃক্ষলতা উদ্ভিদ ছিল, যথেষ্টভাবে গাছপালা নির্মূল করার ফলে এ আচ্ছাদন কমে দাঁড়িয়েছে পাঁচ শতাংশে।

একথা সত্যি যে মারাঠওয়াড়ার সেচের জল নেই। তার চাষের জমির এক-পঞ্চমাংশও টেনটুনে জল পায় না। কিন্তু সেচের জল মানে কি কেবল বাঁধের জল? ভূগর্ভস্থ জল সংরক্ষণ, বৃষ্টির জলধারণ এগুলির কথা ইদানীং যাচ্ছে আখচাষের কোলাহলে। আসলে যেদিন থেকে সমবায় চিনিকলগুলির উত্থান ও বিস্তার আজ থেকে বছর চল্লিশেরও আগে, আখ হয়ে দাঁড়িয়েছে মহারাষ্ট্রের রাজনীতির নিয়ন্ত্রক। সমবায় কথাটি শুনতে ভালো। চিনিকলের আখের সরবরাহ চাষির, তাই সমবায় ব্যবস্থার নিয়ম অনুযায়ী চাষি হল কারখানার অংশীদার। ব্যক্তিগত মালিকানার চিনিকলের সঙ্গে সমবায় কারখানার তফাত তাই নীতিগত। কিন্তু আসলে তা হয়ে দাঁড়িয়েছে বড় আখচাষিদের নেতৃত্বের এক

কেন্দ্র।

এঁদের খবরদারিতে নির্বাচিত হল সমবায় কারখানার চেয়ারম্যান— যাঁর পোশাকি নাম 'মালিক' চেয়ারম্যান এবং বড় আখচাষিরা পরস্পরের হাত মজবুত করে দখল রাখেন এলাকারা। চেয়ারম্যানের প্রভুত ক্ষমতা। স্থানীয় এমএলএর তুলনায় তাঁর সর্বজনগ্রাহ্যতা অনেক বেশি— যেহেতু চাষের অধর্মীতির চাবিকাঠিটি তাঁরই হাতে। তিনশোর বেশি চিনিকলের জন্য কয়েকশো হাজার আখের চাষে নিযুক্ত হয়ে থাকেন তিরিশ লখের কাছাকাছি চাষি। এঁদের মতামত রাজনীতির আঙিনায় মোটেই ফেলনা নয়। শাসকদলের সিংহাসন টলে যেতে পারে এঁরা অসন্তুষ্ট হলে। চিনিকলের জন্য আখ যাঁরা সরবরাহ করেন পশ্চিম মহারাষ্ট্র ছাড়া বিদর্ভ ও জল সংকটে অস্থির মারাঠওয়াড়া— তাঁরা কি জানেন না এর ফলে নষ্ট হচ্ছে কৃষি ও পরিবেশের ভারসাম্য, আখের চাষ বাড়ছে, সেই সঙ্গে কমছে জোয়ার, বাজরা, চিনাবাদাম ও সূর্যমুখীর চাষ। তার ফলে টান পড়ছে জলে, মানুষ ও পশুর দৈনন্দিন খাদ্যে। আখ বড় আল্লাদি ও একগুঁয়ে ফসল। আখ চিবিয়ে সারা বছর পেট ভরবে না, চাষি জানে, তবু মারাঠওয়াড়ার মতো কঠিন অঞ্চলেও সামান্য বৃষ্টিপাত হলেই আখ লাগানো আরম্ভ হয়। আখ সোজা বাড়ে চরচর করে, তার সঙ্গে কিছু সোয়াবিন লাগিয়ে দেওয়া যায়। রক্ষণাবেক্ষণ নামমাত্র— কিন্তু আখ টেনে নেয় সেচের জন্য তৈরি বাঁধের জল, আর যেখানে সেচ নেই, সেখানকার ভূগর্ভস্থ জল।

টানা চলেছে খরা, মানুষ, পশুর স্নানের, পানের জল নেই। ট্যাঙ্কারে জল পাঠানো হচ্ছে খরাপীড়িত গ্রামে, সপ্তাহে একদিন। লাতুর জেলায় বুক ফুলিয়ে ঢাকঢোল পিটিয়ে রওনা করা হয়েছে জলবাহী ট্রেন। অথচ সরকার নির্দেশনামা দিতে পারবে না যে আখের চাষ কমিয়ে বাড়াও জোয়ার, বাজরা, অড়হর, তিল, মুগ ও চিনাবাদামের মতো শস্য। সমবায় চিনিকলের মালিক চাষিরা গোঁসা করবেন। পকেটে টান পড়বে সেইসব ব্যবসায়ীদের খরার মাসে ট্যাঙ্কারে জল সরবরাহ করে যাঁরা ফুলেফেঁপে উঠেছেন। ভূগর্ভস্থ জল টেনে নিচ্ছে চাষের জন্য লাগানো বোরিং পাম্প। এ খেতে চাষ হচ্ছে, ওপাশে চাষির ঘরে জলের হাহাকার। জলন্তর নেমে যাচ্ছে। আখের চাষে জল খরচ হচ্ছে, তার সঙ্গে চিনি কারখানার আখ মাড়াইতে লাগছে বিপুল পরিমাণ জল। একটন আখ মাড়াই মানে এক হাজার লিটার জল। সর্বনাশা, বিধ্বংসী এই জলশোষণ চক্রে হাত দেয় এমন ক্ষমতা কারও নেই। উপর্যুপরি খরা, বর্ষার জলাভাব ৪০ শতাংশের বেশি। অথচ মারাঠওয়াড়ার পরভনির ছেচল্লিশটি চিনিকল চলেছে একদিনও না থেমে। সরকার মুদ্দুরে মাঝেমধ্যে বলেছেন, পানীয় জল নেই, আখের চাষ মুলতুবি থাকুক খরার বছরে। কেউ শোনেনি। কেন শুনবে? আখই একমাত্র ফসল যে জল টেনে মাটিকে রিক্ত করে দেয়। অথচ যার দাম কখনও পড়ে না। দাম পড়তে পারে তুলোর, ডালের, সব্জি ও আনাজের। চিনি ও সোয়াবিন চাষিরা পাবেন ভর্তুকি, দুনিয়া গোল্লায় যাক, নষ্ট হোক জমির উর্বরাশক্তি, তলায় নামুক জলস্তর। আখের দাম পড়ে না। চিনিকলগুলি ভর্তুকি দিয়ে আখ কিনবে। তাই চাষির কোনও মাথাব্যথা নেই।

জলহীন মারাঠওয়াড়া তাই নিজের পায়ে কুড়ুল মেরে চলেছে প্রতি মরশুমে। আখের চাষে শেষ হয়ে যাচ্ছে তার সীমিত সংখ্যক বাঁধের জল, বোরিং টেনে নিচ্ছে মাটির নীচের জল। আর তার আট-দশ লাখ প্রাপ্তিক ও মাঝারি চাষি মজুরর হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, ঘর দুয়ার ফেলে পশ্চিম মহারাষ্ট্রের চিনিকলে, অনাহারে মৃত্যুকে ঠেকাতে। আখ টেলিতে আট থেকে ছ'মাস তারা কি শ্রম ও যন্ত্রণায় কাটায় তা শোনা যাচ্ছে না সাখর কারখানার যুদ্ধনিনাদে। সবই জোগাড় হয়ে যায় আখটেলির আশপাশে। দিশি মদের ভাঁটি বসে যায়, জুয়ার ঠেক। যাতে পুরুষ ঘরে ফেরার পথে তার কষ্টের পয়সার গাঁড় ওখানেই করে আসতে পারে। মেয়েরা খেটে চলে অহর্নিশ কেবল মাথাঢুকু আনাহারের জলের উপর তুলে পাখেতা আখের পাতাগুলি চাষির হাত থেকে বাঁচিয়ে রোজ তিরিশ চল্লিশ টাকার জ্বালানি, তেল, নুন কেনে তারা। অথচ চিকিৎসা নেই, দগড়বাড়ির যে যুবতী মেয়েটি সাপের কামড়ে মারা গেল আখের খেতে, কারখানার মালিকের কথায় তাকে টেলির মাটিতেই গোর দেওয়া হল। না ডাক্তার, না পুলিস।

তিসগাঁও-এর যে রমণী শৌচে গিয়েছিল অন্ধকারে, তার শিশুটি মার পিছু পিছু এসে ডুবে গেল খোলা নালায়। কোনও ক্ষতিপূরণ? কোনও সান্ত্বনা? কিছুই নেই। পরের বার থেকে বুড়ো শ্বশুর-শাশুড়িকেও নিয়ে আসছে সে, বলদ গাড়িতে বসিয়ে, যাতে তারা বাচ্চাগুলোকে দেখে।

বলদ মরলে ইনসিওরেন্স-এর টাকা পাওয়া যায়, চাষি মরলে নয়। এই হল মারাঠওয়াড়ার ভাগ্য।

আখ কাটাই শ্রমিক কখনও আত্মহত্যা করে না। আমরা বেঁচে থাকব, না খেয়ে বা তেষ্টায় যদি মরতে হয়, সে কথা আলাদা। বছরের শুরু থেকেই পাঁচশোর কাছাকাছি আত্মহত্যার খবর এসেছে মারাঠওয়াড়ার নানা জেলা থেকে। বিদর্ভ অঞ্চল জুড়লে সংখ্যা হাজার ছাড়াবে। তুলো চাষে ফসল নষ্ট হওয়া, সেই জন্য ধারের টাকা, বিজলির বিল শোধ করতে না পারা— আত্মসম্মানী চাষি তার মুখ সমাজে দেখাতে পারবে না জেনে গলায় ফাঁস দিয়ে ঝুলে পড়ে, ফেলে রেখে যায় তার বিধবা বউ ও সন্তানগুলিকে। মা-বাবাকেও।

অন্য ফসলের ফলন কম হলে চাষির বিপদ। দাম কমলে অন্যরকম বিপদ। আখের চাষে ফলন কমের ভয় কম। আর আখের দাম পড়ে না। চিনিকল চাষির লোকসান পুষিয়ে দেয় নির্দিষ্ট দামে কিনে। আখের ফলনের চাকা তাই ঘুরতেই থাকে নিশ্চিন্তে, সঙ্গে জড়িয়ে নিয়ে চলে রাজনীতির হিসাবকিতাবকে।

॥ দুই ॥

চক্রব্যূহ

বাবা যখন বাড়িটা বানিয়েছিলেন, তখন দোতলার ন্যাড়া ছাত থেকে সহ্যাদ্রির বিস্তার দেখা যেত। দিগন্ত জুড়ে নীল হরিৎ পর্বতমালা, প্রাচীন এবং ইতিহাসের বহু ওঠা-পড়ার সাক্ষী। বর্ষায় তার অবয়বে মেঘের রঙের মতন সবুজ-মেঘলা ছায় পড়ে, ওগুলি পুরনো বনস্থলীর অবশেষ, বহু জায়গায় পাহাড়ের কোলে নতুন বৃক্ষরোপণও হয়েছে। শরতের শেষ থেকে বর্ষার ফিরে আসা পর্যন্ত রুক্ষ, কালো, গম্ভীর দেখায় পাহাড়ের শরীর। অন্যান্য পর্বতশ্রেণীর মতন সহ্যাদ্রির বঙ্কিম ঢেউ নেই এ জেলায়, পাহাড়ের উপরিতল সপাটসমান, কোথাও কৌণিক অবনমন, যেন পাহাড় নিজেই একটি দুর্গ প্রাকার হয়ে জনপদকে রক্ষা করছে।

শহর তখন অন্যরকম ছিল, শহরই হয়ে ওঠেনি। কাছারি, কোর্ট, বাসস্ট্যান্ড সবই ছিল, কিন্তু এত বাড়ি গজিয়ে উঠে ছেয়ে ফেলেনি সমস্ত ফাঁকা। তাদের গলি রাস্তাটা, যার দু'ধারে এখন ঠাঁসাঠাঁস বাড়ি, তখন ছিল প্রায় খেলার মাঠের সঙ্গে জোড়া। মাঠের শেষে হাইস্কুলের বাড়ি, তার উল্টোদিকে জেলের পাঁচিল, আরও দূরে চোখ গেলে পাহাড়ের দেওয়াল। পাহাড়টা হাতছানি দিয়ে ডাকছে, না। আর বেশিদূর এগতে বারণ করছে, কিশোরী দয়া বুঝতে পারত না।

পাহাড়, তার উপর অজিংক্য তারা দুর্গ, পাহাড়ের কোলে শহর। অজিংক্য মানে মারাঠি ভাষায়— অজেয়। দুর্গের নাম— অজেয় বা অপরাজিত নক্ষত্র। ভাবলেই ছোটবেলায় বুকের মধ্যে দুরু দুরু কেঁপে উঠত দয়ার। আসলে এর মধ্যেও একটা লুকনো

কাহিনী আছে, সাতারা জেলার মানুষ এখন তা আর মনে আনতে চায় না। সপ্তদশ শতাব্দীর দুর্গটির নাম আসলে ছিল আজিম তারা, আওরঙ্গজেবের পুত্র আজিমের নামে। দুর্গের মালিকানা বদল হয়েছে একাধিকবার, রাজা বদলের সঙ্গে সঙ্গে। শিবাজী দুর্গ জয় করেছিলেন সপ্তদশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে। তাঁর উত্তরাধিকারী সাহু শিবাজী বন্দি হন মুঘলদের হাতে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে সাহু মহারাজ অজিংক্যতারা দুর্গ পুনর্বার জয় করেন, এ দুর্গ মারাঠাদের ছিল ১৮১৮ পর্যন্ত। তখন কিন্তু এর নাম অজিংক্যতারা ছিল না। ঔপন্যাসিক নারায়ণ হরি আপ্টে তাঁর ১৯০৯ সালে প্রথম বইয়ে আজিমতারার নাম বদলে যেই "অপরাজেয় নক্ষত্র' করে দিলেন, মারাঠি স্বাধীনতা কল্পনায় তা দিব্যি জায়গা করে নিল।

দয়া যোশী, উকিল ভানু রাও যোশির কন্যা সেই স্বাধীনতা কল্পনা ও স্পৃহার ভিতরে অবগাহন করতে করতে বড় হয়েছে, শিবাজী, শম্ভাজী, শাহুজীর বীরত্বের ও সংগ্রামের কাহিনী পড়ে, স্বাধীন ভারতে শিবাজীর পুনর্জন্মের কথা ভেবে; শিবাজীর উত্তরাধিকার নিয়ে বংশগত অন্তর্দ্বন্দ্বের নানা প্রসঙ্গ সচেতন ভাবে মন থেকে বাদ দিয়ে।

তাঁর যৌবনেও অবশ্য বীরপূজনের এমন বাহ্যিক আড়ম্বর ছিল না। কাহিনী-সিনেমা-সিরিয়াল-জন্মজয়ন্তী পালন ইত্যাদি নিরীহ মাধ্যম ছিল। একুশ শতকের মহারাষ্ট্রের পুঁজির দম্ভ ও আগ্রাসন বাড়তে বাড়তে একদিকে রাষ্ট্রকেই বলতে গেলে গিলে খেয়েছে, অন্যদিকে তার দেশপ্রেমের 'ব্যাখ্যা'ই হয়ে উঠেছে সর্ব সাধারণের গ্রহণযোগ্য। যা কিছু মহৎ, তাকে হতে হবে বৃহৎ, আকাশছোঁয়া, পাথর-ধাতু দিয়ে তৈরি, ক্রেন দিয়ে উঁচুতে তোলা। যে যত বড় মূর্তি বানাতে পারে, সে তত বড় বীর পূজক ও দেশ প্রেমিক। সমুদ্রজল থেকে শিবাজীর সর্ববৃহৎ মূর্তি উঠে না দাঁড়ানো পর্যন্ত এই দেশপ্রেমের শান্তি নেই। বিশেষ করে, ওদিকে যখন নর্মদার সর্দার সরোবর বাঁধের উপর উঠে দাঁড়াতে লেগেছেন বল্লভভাই প্যাটেল মহাশয়।

স্বপ্নালু, রোগা, মাথায় খাটো ঈষৎ নড়বড়ে স্বাস্থ্যের দয়া যোশি কখন যে তরতরিয়ে বড় হয়ে উঠল আর পরিণত হল এক লড়াকু যুবতীতে, তা দেখার জন্য ভানুরাও অপেক্ষা করতে পারেননি। সন্তানদের মধ্যে ছেলেরা বড়, মেজটিও কন্যা। ছোট কন্যাটির দিকে অতটা মন দিতে পারেননি ভানুরাও, কিন্তু তাকে যত্ন সহকারে আইন পড়িয়েছিলেন, আর দিয়ে গিয়েছিলেন লাইব্রেরি ভর্তি আইনের বই। যদি সে চায়, সাতারা কোর্টে প্র্যাকটিস করেই জীবন কাটাতে পারবে, এ শহরে, পাশের জেলা থেকে পুরনো মক্কেলরা কেস্ এনে দেবে। চিন্তা নেই। বিয়ের কথায় মেয়ে স্পষ্ট করেই 'না' বলে দিয়েছিল, কাজেই ভানুরাও আর তাঁর স্ত্রী উষা ও পথে বেশি এগতে পারেননি।

বাবার আমলের ঘর, বারান্দা, রান্নাঘর সবকিছুর নকশা এক একে পাল্টানো হয়েছে এ বাড়িতে। বাইরের বারান্দায়, ভিতরের প্যাসেজে অমন সব ধাতু ও কাঠের মূর্তি, দেওয়াল ছবি আগে ছিল না। মাঝখানের দেওয়াল ভেঙে বসান ঘরটি বাড়ানো হয়েছে, অর্ধবৃত্তাকার সামনের দিকটিতে ওই আকারের বেতের সোফা ও কুশন। সামনে নিচু টেবিল। তার উপরে প্রচুর ফাইল ও কাগজ। ভিতরের দিকে দেওয়াল ঘেঁষা বড়সড় স্টাডি টেবিলে কম্পিউটার। এছাড়া সিডি, বইপত্র, টেবিলের নীচে সাজানো আছে নানা আকারের বাঁশি ও পায়ে বেঁধে বাজানোর যন্ত্র, মঞ্জিরা এই সব। এখানে বসে দীপক। শহর ও বাইরে থেকে সকাল সকালই কেস নিয়ে কথা বলতে কয়েকজন এসেছিলেন, চাষিবাসী, গৃহস্থ, বয়স্ক চাকুরিজীবী তাঁরা চলে গেছেন। এ বাড়িতে মানুষ কখন ঢোকে, কখন বেরয়, কারও পক্ষেই তার সূত্র ধরা সম্ভব নয়। বাইরের দরজা একটা আছে। সেটা সর্বদাই খোলা। পাশের বাড়ি ও এ বাড়ির মধ্যে যে পাঁচিল আছে, তাতে একটা ফাঁক বানানো হয়েছে মাঝখানটা ভেঙে। সেটা এখন এক চতুর্ভুজ আকারের শূন্যতা। ওখান দিয়ে পাশের বাড়ির লোকেরা শর্টকাট করে এ বাড়িতে আসে।

সকাল সাড়ে সাতটার সময় প্রমীলা এসে পৌঁছলে এ বাড়িতে সকাল হয়। প্রমীলা দীর্ঘাঙ্গী, সবল শরীর, মধ্যবয়সিনী, পিঠ ছাড়িয়ে নিপুণ করে বাঁধা লম্বা বেণী নেমে এসেছে। গায়ের রং শ্যাম। মুখে-চোখে ফেটে পড়ছে তেজ আর খুশি। পুরনো সিন্থেটিক শাড়ি, রিফু করা ব্লাউজে পরিপাটি সেজে সে এসে রান্নাঘরে ঢুকলে, এ বাড়ির লোকেরা বোঝে, উঠে বসতে হবে আড়মোড় ভেঙে, কারণ প্রমীলা সকালের চা কাউকে দ্বিতীয়বার করে দেবে না। জলখাবারের পাট চুকিয়ে দুপুর ও রাতের রান্নায় ঢুকে যাবে। দীপক রাত জেগে কাজ করে। দয়া যোশিও তাই। অধ্যাপক অভিজিৎ যোশি তাড়াতাড়ি ঘুমলেও মাঝ রাতের পর কম্পিউটার খুলে পড়াশুনো করেন। কাজেই সকাল সাড়ে সাতটার আগে কারও ঘুম ভাঙে না। একমাত্র ব্যতিক্রম দয়ার মেয়ে অরণ্যা। সে ছটায় উঠে স্পোর্টস্ জুতো পরে কয়েক মাইল দৌড়ে আসে পাড়ায় চক্কর দিয়ে। দয়া বারণ করলেও শোনে না।

—বারণ করবেই বা কেন তুমি?

অরণ্যা রাগে না, তার সুন্দর ঝকঝকে দাঁতের সারিতে খেলে যায় রোদের মতন হাসি। সে পেয়েছে বাবার কোঁকড়া চুল। অ্যাক্টিভিজম্ করব আর বাড়িতে বন্দি হয়ে থাকব। তাই কি হয়? কাঁধ পর্যন্ত চুলের ঘন ঢেউ ঝাঁকিয়ে বলে অরণ্যা।

ক্লায়েন্টরা চলে গেছে। তড়াহুড়ো করে তৈরি হয়ে নিয়েছে অরণ্যা। রান্নাঘরে গিয়ে প্রমীলার হাত থেকে প্লায় ছিনিয়ে নিয়ে গতরাতের একখানা রুটির ভিতর জ্যাম ভরে চিবচ্ছে। এটাই ওর ব্রেকফাস্ট। কাঁধ পর্যন্ত চুল ক্রাচার দিয়ে গুটিয়ে, কোর্টের জন্য সাদা পুরোহাতা শার্ট ও কালো ট্রাউজার্স তৈরি হয়ে গিয়েছে। বাকি রইল তাঁর হাতহিরীন জ্যাকেট আর গাউন। স্নান? না, আজ আর স্নানের সময় হবে না। দেরি হয়ে যাচ্ছে। সন্ধেবেলা

ধীরে-সুস্থে স্নান করলেই হবে। কোথায় লেখা আছে, যে স্নান সকালেই করতে হবে? দয়া রান্নাঘরে পাতা ডাইনিং টেবিলে চা ও সকালের জলখাবার প্রমীলার বিশ্যাত চিঁড়ের 'পোহা' নিয়ে বসেছে। মেয়ের দিকে তাকিয়ে তার মনে যেমন গর্ব হয়, তেমন বুকের ভিতর শিরশিরিয়ে ওঠে একটা ভয়।

অরণ্যার বয়সে কেমন দেখতে ছিল দয়াকে? চট করে মনে পড়ে না—পুরনো ফোটো দেখলে মনে পড়বে নিশ্চয়ই। সাজপোশাক? নাঃ লিপস্টিকের তো প্রশ্নই ছিল না, মুখে মাখার পাউডারও আলাদা ছিল না, ট্যালকম পাউডার দিয়েই কাজ চালানো। আইন পাশ করার পরেই বাবা চলে গেছেন, স্কুলের হেড মিস্ট্রেস মা ছেলেমেয়ে যারা তাঁর হাতের কাছে আছে, সবাইকে কড়া শাসনে রাখতেন। সাদা শাড়ির উপর পুরোহাতা কোট আর গাউন চাপিয়ে কোর্টে গেছে দয়া। অরণ্যা যেমন সহজ, প্রাণবন্ত আর হাসিতে ভেঙে পড়ে কোনও রাখঢাক না করে, তেমন করে হাসার কথা মনেই আনতে পারত না দয়া। তখনও অভিজিতের সঙ্গে তার পরিচয় হয়নি। বিয়ের আগে যে সময়টা তার আর অভিজিতের রোম্যান্সপর্ব ছিল, তখনকার হাসিতেও মিশে থাকত উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা—অভিজিৎই অনেকবার বলেছে দয়াকে।

মা বেঁকে বসেছিলেন। বাবা নেই, তাই বলে মেয়ে জাতের বিচার করবে না? এতদিনের শিক্ষাদীক্ষা, শীল, শৃঙ্খলা সে সবের কী হবে? শূন্যক্লাসের শেষ ছাত্রীটির মতো ছোট মেয়েকে আঁকড়ে ধরেছিলেন মা। তিন বছর কেটে গিয়েছিল, বিয়ের সম্মতি দেননি—তখন নিজেই ঘর ছেড়েছিল দয়া।

পথে নানেনি একেবারে গিয়ে উঠেছিল অভিজিতের বাসায়। জাতি, বর্ণ, বৈষম্যের দাগই যদি মোছা না গেল তবে শিক্ষাদীক্ষা দিয়ে আর কী হবে?

মেয়ে সদর দরজার দিকে পা বাড়াতেই ভাবনার জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে এল দয়া!

অরু, অরু, কোথায় যাচ্ছিস? বলবীর আসেনি যে, গাড়ির চাবি নেয়নি—

আমি অটোতে যাচ্ছি আজ। দেরি হয়ে যাচ্ছে, মা। কেন যে সকালবেলা আমি বসে বসে ছাইপাঁশ ভাবছি—অথচ বলবীর! খেয়ালই হল না যে ও আসেনি! দীপক উঠে এসেছে কাজের টেবিল থেকে। রান্নাঘরের পরিসরের মধ্যেই দেওয়াল ঘেঁষা একটা ডিভান আছে। রাতে সেখানেই তার বিছানা। সকালবেলা প্রমীলা এসে যদি দেখে দীপক ঘুমিয়ে আছে, তখন মুঠোয় জল ভরে ওর গায়ে ছেটাবেই। এ ঘরটার মধ্যেও আগে দেওয়াল দিয়ে ভাগ করা ছিল। দেওয়াল ভেঙে দেওয়া হয়েছে, তাও বেশ কবছর হল। সাবেক পাথরের টালির মেঝে, কাঠ ও বেতের আসবাব। ছাত থেকে ঝুলন্ত কড়ির শিকে, পুরনো তামার কলসি, জল রাখার—সব মিলিয়ে ঘরের মধ্যে একটা উষ্ণতা জড়িয়ে থাকে সারা সময়। এখানেও মানুষজন আসে, বসে। দূর থেকে কেউ এলে খেয়ে যাবেই—হোটেলে গিয়ে খেয়ে আসা, তা ড্রাইভার, পত্রবাহক যে-ই হোক, দয়ার পছন্দ নয়। বাবার সময়েও এ ছাড়ি খোলামেলাই ছিল। ছোটবেলা থেকে দেখে এসেছে দয়া। কাজের ও বসবাসের সুবিধের জন্য কাঠামোয় কিছু বদল করলেও বাড়ির চরিত্র সে বদলাতে দেয়নি।

দীপক বলল, দাঁড়াও না, আমি বলবীরকে ফোন করে নিচ্ছি। এসে গাড়ি নিয়ে কোর্টে পৌঁছে যাবে। কথা বলতে বলতে দয়ার পিছনে এসে দু'কাঁধ ধরে একটু ঝাঁকিয়ে দিল। বছর তিরিশের যুবক দীপক লম্বা, দয়ার মাথা ওর চিবুকের নীচে। দয়ার পরনে এখনও রাতের পোশাক। পুরোহাতা, সুতোর একটা গাউন।

তুমি এবার চান করো, বুঝেছ, মেয়েকে 'ফলো' কোরো না। তৈরি হয়ে নাও, আমাদের বেরতে হবে তো!

অভিজিৎ আর দয়ার একটিই সন্তান, অরণ্যা। কিন্তু এ সংসারে বাতাসে ভাসা তুলোর বীজের মতন উড়ে চলে এসেছে দীপক, আর থেকেই গেছে। যখন স্কুলে পড়ত, হঠাৎ হঠাৎ চলে আসত, অরণ্যার সঙ্গে হুটোপাটি করত, খেলত, পুতুল বাক্স লুকিয়ে দিত। বাড়ি ছলে যেত সন্ধের মুখে। কখনও আবার ইচ্ছে হলে থেকেও যেত রাতে। দয়া বলত, মা-কে বলে এসেছ, দীপক? প্রথমে ঘাড় নেড়ে বলত, হ্যাঁ—বলেছি। তারপর ছুটে বেরিয়ে যেত, বলে আসতে। এ বাড়ির গলির পর পাশাপাশি আরও দুটো গলি। শেষেরটার মাঝামাঝি দীপকদের বাড়ি। পাঁচ মিনিটের পথও না। কিন্তু ক্রমশ দেখা গেল, ওইটুকু পথ পেরিয়ে যেতেও ছেলের আপত্তি। দয়া খুঁতখুঁত করত, ওকে ফেরত পাঠাতে চাইত—ওর ভয় হতো দীপকের বাবা-মা ওদের না ভুল বোঝেন। পথে-ঘাটে দেখা হলে তাঁরা যে আজকাল মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন, কথা বলছেন না, দয়া খেয়াল করেছিল। অভিজিৎ বরাবরই শান্ত, বিচক্ষণ, স্বভাবের গুণে অধ্যাপনা ছাড়াও প্রশাসনিক দায়িত্ব পেয়েছে কলেজে। ও বলত, তুমি নিজে থেকে কিছু বলো না। ছেলেটাকে ফেরত পাঠালে ও যদি বাড়ি না গিয়ে অন্য কোথাও চলে যায়—তার দয়ও তো আমাদের! এখানে রাতে থেকেই যেতে চাইলে, থাক্ না!

একদিন নিজের জামাকাপড়, বইপত্র আর কম্পিউটার; বাঁশি, তবলা, ছোট ড্রাম, সব একটা অটো রিকশায় চাপিয়ে পাকাপাকি চলে এল দীপক।

সেদিন আবার, কী অদ্ভুত, অভিজিৎ শহরের বাইরে, অরণ্যা কলেজ থেকে ফিরে সোজা বন্ধুর বাড়ি, প্রমীলা আসেনি, আর দয়া গেছে তার অভিযানে। ফিরতে রাত হবে। এত সব ঘটনার সমাপতন একদিনে হওয়া বিশ্বাসযোগ্য নয়। তবু রাত এগারোটায় বাড়ি ফিরে দয়া দেখে জিনিসপত্র নিয়ে বাইরের বসার বেঞ্চটাতে অন্ধকারে বসে আছে দীপক। একা। ওর বুকের মধ্যে ধক্ করে উঠেছিল। সেদিনই ও মনে মনে ঠিক করেছিল, দীপককে এখানে থাকা ও ফিরে যাওয়া নিয়ে ও আর কিছু বলবে না।

ঘর ও বাহির মিলিয়ে অনেক কিছুই হল জীবনে, স্নানের পর চুল বাঁধতে বাঁধতে দয়া ভাবে। বিনুনি বেঁধেই স্নানে যায়। তবে তার পর কোনও কোনও দিন খুলে আবার বাঁধে। যে মেয়ে বলেছিল বিয়েই করবে না, সে বিয়েও করল। ফিরে এল নিজের শহরে, বাপ-মায়ের ঘরেই। এখন এই বাড়ি তার ঘর, কাজের জায়গা দুটোই। এক সন্তানই যথেষ্ট মনে করেছিল তাঁরা, অভিজিৎ আর দয়া। এখন তাঁর দুটি সন্তান। দীপক যে বাবা-মায়ের কাছে আর ফিরবে না, তা স্পষ্ট। ওর থেকে ছ'বছরের ছোট একটি ভাই আছে, বাবা-মা তাকেই গড়ে-পিটে তৈরি করায় মন দিয়েছেন। মনে হয় দীপকের ব্যাপারে হাল ছেড়ে দিয়েছেন ওঁরা। তবে দয়া অভিজিতের সঙ্গে সম্পর্ক এখনও স্বাভাবিক হয়নি।

বাইরের কাজও দেখতে দেখতে বেড়ে গেছে দয়ার। জেলা কোর্টে ওকালতি করে জীবন আরম্ভ হয়েছিল তাঁর, ভানুরাও যোশিরই মতন। বাবার কিছু বন্ধু, যথেষ্ট বয়স্ক, তখনও প্র্যাকটিসে। তাঁদের রেফারেন্সে বেশ হাইকোর্টেও কেস লড়তে গেছে দয়া। সংসার চালানোর জন্য টাকার অভাব নেই। অভিজিৎও ভালো রোজগার করে। কিন্তু একদিন সকালের পর তাঁর জীবন বদলে যেতে থাকল, জটিল হয়ে উঠল কাজ, বেঁচে থাকা সবকিছু।

অরণ্যা তখনও ছোট, ক্লাস ফোর-ফাইভে পড়ে, দীপক ওর চেয়ে ছয় বছরের বড়। তখনও তার এ বাড়িতে আসা-যাওয়া অনিয়মিত, হঠাৎ করে হাজির হয় কোনওদিন সকালে, কখনও বিকেলে। একদিন কোর্টের ছুটি ছিল, তাই বাড়িতেই আরাম করে খবর কাগজ, বইপত্রের পাতা ওল্টাচ্ছিল দয়া; তখন প্রমীলার মা শকুন্তলা ওদের কাছে আসত কাজে সাহায্য করতে।

বাবার তৈরি পুরনো বাড়িই দাঁড়িয়ে তখন, দোতলার ঘরগুলি যেগুলি হয়নি, এক তলাতেও দেওয়াল ভেঙে নকশা বদলের পর্ব শুরু হতে দেরি।

শকুন্তলা এসে জানাল, বাইরের বারান্দায় ছোট ব্যাগ নিয়ে একজন বসে আছে, হয়তো দূর থেকে এসেছে, দেখা করতে চায়।

দেখা করতে আসা কাউকেই ফেরায় না দয়া, কে জানে কার কেমন কেস, কে কী বিপদে পড়েছে—মানুষটি ভিতরে এসে বসল। দীর্ঘ দেহী, লম্বা শার্টের সঙ্গে ঢোলা পাজামা পরা—রঙিন জামার বহর দেখলেই বোঝা যায় ভিন রাজ্যের মানুষ, মাথার চুল ঘন কালো ছোট করে ছাঁটা, মোটা পাকানো গোঁফ উপর দিকে তোলা, স্বাস্থ্যবান। মরাঠি খুব ভালো বলতে পারে না, হিন্দিতে কথা বলছিল। অদ্ভুতভাবে চায়ের কাপ ধরেছে, হাতের মুঠো দিয়ে কাপটা জড়িয়ে চুমুক দিচ্ছে। সারারাত বাস জার্নি করে এসেছে। বাসস্ট্যান্ডের কাছে শিবাজীর বড় মূর্তি আছে। ওখানে গিয়ে আপনার নাম বলতে বাড়ি নিয়ে এল রিকশ। ছোট শহর তো, এখানে সবাই চেনে সবাইকে। আর কিছু নয়। আমার কথা শুনলেন কার কাছে? লোকটি গোঁফের ফাঁকে হাসল অদ্ভুতভাবে। নাম জেনেছি পরের। তবে আপনাকে আমি দেখেছি। আপনি এসেছিলেন, দুপুরে খেয়েছিলেন আমার ওখানে...

আপনার বাড়িতে দুপুরের খাওয়া... ভাবতে চেষ্টা করছে দয়া— মানুষটির চেহারা চেনা নয়... এমন হতে পারে, যে বাড়ির গৃহিণী যত্ন করে খাইয়েছেন, অথচ কর্তা সামনে আসেননি। অতিথি এক মহিলা হলে গৃহকর্তা সামনে আসটা বাহুল্য মনে করতে পারেন। সবাই তো আর অভিজিৎ নন। অভিজিতের মা বাঙালি। স্নানের আগে বেণী বাঁধার সময় শাশুড়ির কথা একবার মনে পড়বেই দয়ার। বাঙালি মেয়েরা রোজই চুল ধুলে পুরো মাথা ভেজায়, তারপর ভেজা চুল মেলে দেয় পিঠে। বাঙালিদের আরও কিছু অন্যরকম ব্যাপার-স্যাপার আছে, মরাঠিদের মতনই ওরা বই পড়তে ভালোবাসে, আর সঙ্গীত, কিন্তু ওদের জীবনে শৃঙ্খলা অতটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, খোলামেলা, সংস্কারহীন, আলাপে আগ্রহী, আর মেয়ে পুরুষের হিন্দুস্থান-পাকিস্তান বিভাজন মানে না।

না, না, আমার বাড়িতে নয়—বাড়ি আর কোথায় আমার—ভাত-রুটির হোটেল আছে একটা—শিরুর কাসার তালুকাতে, সেখানেই এসেছিলেন আপনি, ফেরার তাড়া ছিল, মেয়েদের হাইস্কুলে প্রোগ্রাম ছিল আপনার।

লোকটি কখন তার নিজের কেস-এর ব্যাপারে কথা বলবে, ভাবছিল দয়া। দূর মারাঠওয়াড়া থেকে এসেছে, পুরো রাত বাসে এসে, ছোটখাট কেস-এর জন্য স্থানীয় উকিলই যথেষ্ট। তবে অনেক সময় ক্রিমিনাল কেস-এ অপরাধী পক্ষ মহিলা আইনজীবীদের মনে করে সফট টারগেট, পুরো তথ্য না দিয়ে তাদের দিয়ে ব্রিফ নেওয়ানো সহজ হতে পারে।

—আর একটু চা পাব? আপনাদের এই মারহাট্টা দেশে, সব চিজ বড়, কিন্তু চায়ের কাপ... দু'কাপ না খেলে আমাদের মতো বিহারী লোকের তেষ্টা মেটে না। যশোবন্ত বলল।

—আমি কোনও কেস নিয়ে আসিনি আপনার কাছে। বলতে এসেছি, ওই যে মেয়েদের স্কুলে আপনি গিয়েছিলেন, প্রোগ্রাম করতে—স্কুলটাই যদি না থাকে, মানে মেয়েরাই যদি না থাকে আর...মেয়েদের যে হারে নিকেশ চলছে তাতে... দশ বছর পর কর শুনে মেয়ে পাবেন না। অথচ আইন তো একটা হয়েছে শুনেছি। জন্মের আগে মেশিন দিয়ে জাঁচ হলে বেআইনি হবে, না মেয়ে... তবে, জাঁচ হচ্ছে কেন এত? কেনই বা ডাক্তারদের এত রোয়াব? আপনি তো আইন জানেন। কিন্তু আইন যদি কাজ না করে, তবে তার দাওয়াই কী? সে দাওয়াই দেবে কে?

দয়া আশ্চর্য হয়েছিল। মেয়েদের স্কুলে ডাক পেলে সে চলে যায়, না বলে না। ডাকে শহরের মহিলা দয়ার খুব অবাক লাগছিল।

তার সামনে বসে একজন বহিরাগত, ভাত-রুটির হোটেলের মালিক, যাকে চলতি কথায় বলা যায় ঢাবাঅলা, পরামর্শ দিচ্ছে জন্মের আগে ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণের কেসে কীভাবে ধরা যায় ডাক্তার টেকনিশিয়ানদের! এক রাত বাস জার্নি করে এসেছে অচেনা এক মহিলার বাড়ি—এই অজুহাতে যে দয়া কোনওদিন ওর হোটেলে খেয়েছিল!

স্টিং অপারেশন! শুনতে চমকদার! খুব পাবলিসিটি পাওয়া যায়। টেলিভিশন জার্নালিস্টরা ঝুঁকি নিয়ে এই সব করে। দয়া কেন এর মধ্যে ঢোকার ঝুঁকি নেবে? যদি কোনও কারণে ভুল ক্লিনিকে ঢোকে আর কেস ব্যাকফায়ার করে তার এতদিনের সুনাম নষ্ট হয়ে যাবে।

—নষ্ট হবে না। আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি। আমি আপনাকে খবর দেব। ঠিক খবর দেব। কোনও রিস্ক থাকবে না।

—আপনার স্বার্থ কী? মানে, আপনি এই সব লিঙ্গ নির্ধারণের ব্যাপারে কীভাবে খবর নিতে লেগেছেন? ব্যক্তিগত কোনও অভিজ্ঞতা? কোনও ক্ষতি?

—আপনাদের মতো ভদ্রলোক নই বলে বলছেন? যশোবন্ত ভুরু কুঁচকোয়। মহিলা নই, মা নই, বাপ তো হতে পারি!

—ভদ্রলোকদের অবস্থা তো দেখলাম। লেখাপড়া জানা স্বামী, শ্বশুর-শাশুড়ি, শিক্ষিত পয়সাঅলা ডাক্তার, রেডিওলজিস্ট।

—যে জন্মায়নি তাকে মারতে এদের হাত কাঁপে না! আগে কেবল মানুষের হাত ছিল, এখন টেকনোলজি, যন্ত্রপাতি এসে জুটেছে।

—না, না, আমি সে ভাবে বলিনি! হঠাৎ করে আপনাকে দেখলে বোঝা যায় না মনে কী ভাবনা কাজ করছে— যে ডাক্তার অজাত মেয়ের প্রাণ নেবে বলে ছুরি শানাচ্ছে, তার মুখ দেখলে কিছু বোঝা যায় কি?

যশোবন্তের ভুরু কিছুটা সোজা হল। দয়া মনে মনে ভাবল, যাক খুব বেঁচেছি! প্রসঙ্গটা ঘুরিয়ে নেওয়া গেছে!

যশোবন্ত সেদিন বলে গিয়েছিল। আবার এসেছিল কিছুদিন পর। তারপর আবারও। বিড জেলার যে সব প্রান্ত দয়া আগে দেখেনি, সেখানে ওকে নিয়ে গেছে। তালুকা শহরের প্রান্তে গড়ে ওঠা বাকবাকে ততকাকে নতুন বাড়িগুলির ভিতর বাইরে সব দেখিয়েছে। আজ তো যশোবন্ত ঘরের লোক, দয়ার আন্দোলনের শক্ত হাত। ভাগ্যিস সেদিন ওকে ভিতরে ডেকে নিয়েছিল, বাইরের বারান্দা থেকে ফেরায়নি দয়া!

বাইরে বেরবে বলে জিনিসপত্র গুছিয়ে নিচ্ছিল দয়া। জলের বোতল, কিছু শুকনো খাবার, মিটিং-এর জন্য মরাঠিতে ছাপা চটি বই, পোস্টার। দীপক তার গানের সরঞ্জাম, ক্যামেরা এবং ডিজি ক্যামও সবসময় সঙ্গে রাখে। এখন দীপকই আবার বাইরে থেকে ভিতরে এসে ঢুকল।

—বলবীরকে ফোনে পাচ্ছিলাম না। এই মাত্র পেলাম। আজ ও আসতে পারবে না। স্কুটারের সঙ্গে একটা অটোরিকশার ধাক্কা লেগেছে মুখোমুখি, পওয়াইচকের ডানদিকে। বলবীরের পায়ে চোট লেগেছে, ছাল উঠে গেছে, রক্তও বেরিয়েছে।

ফিল্ডে যে বড় গাড়িটা ওরা নিয়ে যায়, সেটা চালায় দীপকই। ছোট গাড়িটা অরণ্যার। কিন্তু কোর্টে যাবার সময় এবং লং ড্রাইভেও অরণ্যাকে গাড়ি চালাতে দেবে না দয়া। বলবীর তার সব সময়ের সঙ্গী। বলবীর কেবল গাড়ি চালায় না কোর্টে পৌঁছে সে ঘোরঘুরি করে, যে কোর্টে অরণ্যার কেস তার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে। এটাই তার কাজ। অন্য ড্রাইভারদের সঙ্গে বাইরের গাড়ির পার্কিং-এ গল্পগুজব করার অনুমতি তার নেই।

যদি কোনও দিন অরণ্যা তাড়াহুড়ো করে আটারিকশ নিয়ে কোর্টে চলে যায়, বলবীর দৌরিতে এলেও গাড়ি নিয়ে কোর্ট পৌঁছে যাবে। দয়া শহরে না থাকুক বা থাকুক, এটাই তার নির্দেশ। অরণ্যা জানে, বিরক্তও হয়, কিন্তু কোনও কোনও ব্যাপারে মা এতটাই ভানড় যে আপত্তি করে উঠতে পারে না।

তাড়াহুড়ো করে সকালে বেরিয়ে যাওয়া, বলবীর আসার আগেই, এটাই তার একমাত্র বিদ্রোহ।

আজ দয়ার মন কিছুটা উতলা। বলবীর আসেনি। পৌঁছতেও পারবে না সারাদিনে। দয়া দীপকের নিয়ে শহরে বাইরে চলে যাচ্ছে। ওদের ফিরে আসতে সন্ধে হবে। অভিজিতের কলেজের পড়ানো, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কাজ—ও-ও খুব ব্যস্ত থাকবে। দীপককে দয়া বলল, কোর্টের রাস্তা হয়ে চলো যাই। দয়া কিছু ভেবেছে মনে মনে, কিন্তু বলছে না, দীপক বুঝতে পারছে।

আজ অরণ্যার সেশন কোর্টে যাওয়ার কথা—কোনও একটা সাবমিশন এর কাজ আছে বলেছিল। কোর্টের রাস্তাতে বড় জ্যাম হয়ে আছে, সাইকেল, স্কুটার গাড়ি মিলিয়ে বিকট জট পাকিয়ে আছে, ওরা মিনিট দশেকও এগতে পারল না একচুল। কী ব্যাপার! একটা-দুটো ট্রাফিক পুলিস তো মোতায়েন করতে পারে—এ রাস্তা দিয়ে গাড়ি এগবে কী করে?

কোর্টের কাছে পৌঁছে দয়া বললেন, তুমি একটু নেমে গিয়ে দেখো তো দীপক—আমি স্টিয়ারিঙে বসছি। ওরা দু'জন জায়গা বদলাল। তারপর দীপক নেমে হনহন করে হেঁটে গেল। কোর্টের সামনে পুলিসের জমায়েত, কর্ডন করে রেখেছে জায়গাটা, পথচারীদের এগতে দিচ্ছে না—কর্ডনের ওপাশে তাকিয়ে ও উদ্‌ভ্রান্ত অরণ্যাকে দেখতে পেল। এলোমেলো ভাবে গাউনটা গুঁটিয়ে ধরে আছে, কোটটাও, কপালে চুল আটকে আছে ঘামে। দীপককে দেখতে পেয়েছে, ঘুরে উল্টোপথ দিয়ে আসছে তাড়াতাড়ি; আজ সেশন কোর্টের চার নম্বর হলে একটা বোমা ফেটেছে, বেশি সাংঘাতিক কিছু না, দেশি ক্রুড বোমা, তবে একজন পেশকার আর একজন উকিলসাহেব আহত হয়ে হাসপাতালে গেছেন। অরণ্যা ঠিক তখনই বেরিয়ে আসছিল ওর সাবমিশন কাজ, একটুর জন্য বেঁচে গেছে।

—ফোন করিসনি কেন? দীপক বকুনি দেবার মতো গলা করল। আমি তো ভেবেছি বলবীর আসবে, বাড়ি চলে যাব সোজা।

উৎকণ্ঠায় গাড়ি বন্ধ করে রাস্তায় নেমে দাঁড়িয়েছিল দয়া। মেয়ে কাছে আসতে তন্নতন্ন করে দেখল, চোট লাগেনি কোথাও। হুড়োহুড়ি শুরু হয়ে যেতে পড়ে গেছিল, হাঁটুতে লেগেছে। দয়ার বুকের ভিতর থেকে সেই পুরনো উদ্বেগটা কাঁপুনি হয়ে উঠে আসছিল। উদ্‌ভ্রান্ত অরণ্যা ওর পাশে বসেছে, মেয়েকে জড়িয়ে ধরে আছেন দয়া। দীপক গাড়ি ঘোরানোর চেষ্টা করছে, বাড়ির দিকে যাবে। ভিড় এতক্ষণে একটু যেন হালকা হয়েছে।

যা মনে হচ্ছে তা বলা যাবে না। নিজেকে ছাড়া কাউকেই না। সংযত থাকার চেষ্টা করছেন দয়া। অনেকগুলি সমাপতন। বলবীরের পায়ে চোট লাগা। ওর সময়ে পৌঁছতে না পারা এবং ওর একেবারেই উভিটিতে আসতে না পারা। ক্রুড বম্বটা দয়ার জন্যই ফাটানো হয়েছে, একটু কেবল চমকে দেবার জন্য। সে নয় হল। যে এই কাজটার সুপারি দিয়েছে, তার কাছে দয়া অরণ্যা দীপক সবার গতিবিধির খবর আছে এটা স্পষ্ট। দয়ার বেরিয়ে যাওয়ার কথা শহর ছেড়ে অনেকটা আগেই। বলবীরের আসার কথা নয়। অরণ্যা অটো নিয়ে কোর্টে গেছে।

যশোবন্ত দয়াকে চক্রব্যূহের রাস্তা দেখিয়েছিল অবশ্য, কিন্তু প্রবেশ করেছিলেন তিনি নিজে, গত দশ বছরে কত ভীমরুলের চালে ঢিল পড়ল, কত লাখ টাকার লেকসান হল, তার হিসেব তিনি রাখতে পারেননি। এখন এ ব্যূহ ছেড়ে নিজে বেরিয়ে আসা সম্ভব নয়, ইচ্ছেও নেই দয়ার।

॥ তিন ॥

টোলির মাঠে সন্ধে

নকোশি উঠে দাঁড়িয়েই দেখতে পায় আখের পাতার বিছনের উপর কাস্তেটা শুয়ে আছে। ওর কাঁধে ঘুমন্ত আট মাসের শিশু, সদ্য জন্মানো মেয়েটা, এতক্ষণ বুকের দুধ খাচ্ছিল, এখন ঘুমিয়ে পড়েছে মায়ের কাঁধে মাথা রেখে। ওর মাথার উপর পাতলা কাঁথা ওড়না রেখেছে নকোশি, যাতে দুপুরের রোদ না লাগে। এবার বাবলার দুই ডালের মধ্যে কাপড়ের দোলনা টাঙিয়ে মেয়েকে ঘুম পাড়িয়ে দেবে নকোশি— তারপর আবার যাবে আখ কাটিছাঁটি। যাবার আগে উবু হয়ে বসে দুটো বাজরার ভাকরি খেয়ে নেওয়া। সঙ্গে একটু লেবুর আচার।

কাস্তেটা কি ওর দিকে চেয়ে আছে? হাসছে? ধ্যাৎ, তাও আবার হয় নাকি? খিদেয়, গরমে নকোশির মাথাটাই গেছে। ফলার উপরের দিকটা মোটা, নীচের দিকটা কোমরের মতো সরু, লোহার মজবুত ফলা, হাতলটা কাঠের, তাতে ফলটা লাগানোর জন্য লোহার বল্টু তিনখানা। সেইগুলোই যেন চোখের মতো তাকিয়ে আছে নকোশির দিকে। হাসছে চোখ মটকে।

কিন্তু কাস্তেটা এভাবে এখানে ফেলে গেল কে? ওর বর সাগর তো অনেকক্ষণ হল কাজে চলে গেছে। বাবলার তিন-চারটে গাছ অনেকদিন আগে গজিয়ে উঠেছিল আখ খেতের আল বরাবর। তারা এখন দুপুরের রোদে ছায়া দিচ্ছে। বাবলার ওই ছায়াতে এসে বসেছে তারা পাঁচ-ছ'জন। বিড় জেলার সাঙ্গেবাড়ি গ্রামের মজদুর সব। দু'জন মেয়ে, দু'জন মরদ। আর একজন বুড়োমানুষ। সে নকোশির শ্বশুর হাতোই। হাতোই এর আর কাজ করবার কোনওই লক্ষণ নেই। দিনে-দুপুরে নেশা করে চুর হয়ে বসে আছে সে, আর হিজিবিজি বকছে আপন মনে, হাসছে। ওদের গ্রামের অন্য বউ দুটি অ্যালুমিনিয়ামের মুখবন্ধ পাত্রে ঠেসে বাজরার ভাকরি নিয়ে এসেছে, সঙ্গে দুধের ক্যানে করে দইয়ের ঘোল, এ দেশে বলে 'তাক', তাই খেকে নকোশিকেও দেবে ওরা বলেছে। বিয়ের পর বর সাগরের পীড়াপীড়িতে নকোশির নাম বদলে করা হয়েছে মিনু। কিন্তু কেবল সাগর আর দয়া তাঁই ছাড়া কেউ তাকে মিনু বলে ডাকে না। না শ্বশুরবাড়ি, না পাড়াপ্রতিবেশী। জন্মের সময়কার লজ্জা তার সারা শরীরে লেপে দিতে পারলেই যেন ওদের আনন্দ।

মেয়ের পর মেয়ে হলে, তাও আবার অনেকগুলি, শেষ কন্যাটির নাম রাখার চল আছে 'নকোশি', 'নকো' মানে আর না। 'নকোশি' নাম রেখে নিজেদেরই বলা, আর মেয়ে চাই না। জন্মের পর মায়ের লুকিয়ে ফেলা চোখের জল আর বাপের কপাল চাপড়ানো দেখেছে মিনু। বাসি রুটি, ডাল, তরকারি ছাড়া ভাত খেতে খেতে ঠাকুমার ঠেস দেওয়া কথা শুনেছে। কিন্তু তারা মিনুকে সত্যি সত্যি মেরে ফেলেনি, এটা ভাবলে অবাক লাগে। ওদের জেলার মেয়েদের তো এখন জন্মাবার আগেই মরার ফতোয়া হয়ে যায়। 'নকোশি'র জায়গায় এসেছে 'নাহিশি'— মানে 'আর চাই না' থেকে সমাজ পৌঁছেছে 'একুনি মর' এর পর্বে। 'নকোশি'র পেটেও যখন প্রথম বাচ্চাটা এল, তখন শ্বশুর-শাশুড়ি সব একচাট্টা হয়ে তাকে নিয়ে যেতে চাইল শিরুর কাসারের দালানের কাছে, সেখান থেকে জেলা সদরে ডাক্তারবাবুর ক্লিনিকে। মেয়ে হবে জানার পর থেকেই পেট খসাবার জন্য তেড়েফুঁড়ে উঠেছিল শ্বশুরবাড়ির সব। হ্যাঁ, মানতে হয় তার বর সাগর একটা সত্যিকারের পোক্ত মানুষ। বাপ-মায়ের মুখের ওপর বলে দিল— ওসব কিছু হবে না। যে আসছে, সে ছেলেই হোক, আর মেয়েই হোক, থাকবে। মিনু, তুই কিন্তু কিছু খাবি না— আমাকে না দেখিয়ে। মা তোকে জড়িবুটি যদি এনে দেয়— লুকিয়ে ফেলবি! দয়া তাঁই কাজ করতে এসেছে ওদের গ্রামে কতবার, ওরা যে সময়টা গ্রামে

থাকে, মেয়েদের সঙ্গে বসেছে, মাটিতে পাটি পেতে। পুরুষদের ডেকেছে, মোড়লদের ও। দেশে মেয়েদের গিনতি কমে যাচ্ছে, তাতে কী মুশকিল ঘটতে চলেছে, এই নিয়ে কথা বলেছে, বুঝিয়েছে। মেয়েরা বলে এসব ব্যাপারে তাদের কোনও হাত নেই, পুরুষরাই সব। তাদের বর, ভাশুর, শ্বশুররা কেউ দয়া তাঙ্গি-এর নিন্দে করেছে আড়ালে, কেউ চুপ করে থেকেছে। সাগর কিছু বুঝেছে দয়া তাঙ্গি-এর কথা, বাড়ি এসে গল্প করেছে মিনুর সঙ্গে। যখন ফসলের মরশুমে কাজ থাকে না, সাগর খবর এনে দেয় শিকর কাসারের ঢাবাওলা যশোবন্তকে, ক্লিনিকগুলোর আশপাশে ঘুরে খবর রাখে। ডাক্তারদের কাছে কোন গাঁয়ের কেস আসছে, কাদের বলে দিচ্ছে ডাক্তার, পেটের বাচ্চাটা ছেলে, না মেয়ে। নকোশির বেলায় যেমন বলেছিল। মুখে তো আর বলে না, লিখেও দেয় না। ঠারেঠোরে, চোখের চাউনি দিয়ে বলে। আইনে বারণ আছে, বারণটা এইভাবে টপকায়। সেই দাঁচের দিনটা আজও ভোলেনি মিনু। কীভাবে যেন ও হয়ে গেল দয়া তাঙ্গি-এর কাজের সাথী।

মেয়ে হলে বড় চাষির ঘরেও কান্না আর কপাল চাপড়ানো। মেয়েকে জন্ম থেকে পুরুষের হাত থেকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে বড় করার উদ্বেগ, তারপর পণ দিয়ে বিয়ে দেওয়া, বিয়ের পর জামাই-শ্বশুর-শাশুড়ি আরও চাঁকা, মোটর গাড়ি, গয়নার জন্য চাপ দেবে, তারপর একদিন পোকা মারার বিষ খাইয়ে দেবে কিংবা ঝুলিয়ে দেবে আড়া থেকে। কী দরকার বাবা? মেয়ের জন্ম মানে কষ্ট, খরচ আর মনস্তাপ। তারচেয়ে পেটে আসার সঙ্গে সঙ্গেই কিছু খরচ করে নিকেশ করে দিলে নিশ্চিন্ত। তাদের মতো ছোট চাষি যারা না পায় সেচের জল, না বৃষ্টি, আর প্রতি বছর বিড জেলার ফাটা চটা ফসল না গজানো থেকে পিছনে ফেলে সাতারার আখের খেতে ফসল কাটতে আসে, মেয়ে হলে শ্বশুরবাড়ির লোক বলে— এক কইতা কমি। কইতা মানে কাস্তে। বউকে ঘর থেকে আনা হয়েছিল, এই জন্য, যে সে নিজে বরের কাস্তেতে শামিল হবে, আর আনবে দুটো তিনটে পুরুষসন্তান। তারা বাড়াবে পরিবারের কাস্তের সংখ্যা। মেয়ের জন্ম দিলে এ বাড়ির লাভ কী? সে তো চলে যাবে পরের বাড়ি, তাদের ভালো-মন্দ বুঝবে, এ বাড়ির কাস্তে কমে যাবে। যে সন্তান 'কাস্তে' হবে না এ বাড়ির, তার পিছনে খাওয়ানো-পরানো লেখাপড়া শেখানোর খরচ সবই নষ্ট।

মাটিতে নুয়ে পড়ে থাকা কাস্তেটা তুলে নেয় নকোশি— নিজেকে মনে মনে আজকাল মিনু বলেই ডাকে সে, সাগর ছাড়া অন্য কেউ এ নাম নাই বা নিক। এমনভাবে আচখা খেতের মাটিতে বিছানো আখপাতার উপর শুয়ে আছে অন্তটা, যে কেউ হোঁচট খেয়ে পড়লে রক্তারক্তি হতে পারে। একধারে গাছের তলায় খাবারের পাত্রগুলি জমা করা আছে। সেখানে কাস্তেটাকে রাখে মিনু তারপর গাছের ডালে দোলনা করে মেয়েকে রাখতে যায়। ওদের গ্রামে অন্য প্রৌঢ়া মনুমাসি দোলনা বাঁধায় হাত লাগায়। ওরা দু'জন মিনু আর মনুমাসি এমনভাবে ঝুলা বাঁধে যাতে গাছের ছায়া মেয়ের মুখে থাকে আরও কিছুটা সময়। পুবদিকে মাথা দিয়ে দিচ্ছে মেয়ের, পশ্চিমের রোদ ঢলছে ওদিকে আখের খেতের উপর। আলতো মুঠি খোলা দু'হাত মাথার দু'পাশে, দেখে মনে ঘুমোচ্ছে। এক পা অন্যটার উপর রাখা। ও কি স্বপ্নে কিছু দেখতে পায়, যা খুশির, ভালোবাসার?

এবার পরিবার জমে উঠেছে মিনু আর সাগরের। প্রথম মেয়েটা তাদের স্কুলে যেতে লেগেছে। পরের ছেলেটা অঙ্গনওয়াড়িতে। শাশুড়ি আছে গ্রামে, তাদের দেখবে। এই ছোট্ট মেয়েটা এখনও তার দুধ খায়। তাই একে স্কুলে আনতে হয়েছে টোলিতে। একটু বড় হলে একেও স্কুলে দেবে, তারপর ছেলেমেয়ের সঙ্গে গ্রামেই থেকে যাবে মিনু। টোলিতে আসবে না।

আখ কাটাই মজদুর ছেলেমেয়ের জন্য হস্টেল খুলেছে সরকার। সেখানে ছেলেই প্রায় সব। মেয়েদের আঙুলে গোনা যায়। মেয়েদের জন্য যোগাবে কম আসছে, তাতে মেয়েশূন্য হয়ে যাবে তাদের গ্রাম, তালুকা, জেলা— কেউ কি বুঝতে চাইছে না?

স্কুলে যাবে, কলেজে, তারপর — একটু লজ্জা আর সংকোচ হলেও ভাবে মিনু, দয়া তাঙ্গি-এর মতো উকিল হবে তার মেয়ে— কালো কোট গাউন পরে কোর্টে—

কাছেই কোথাও শব্দটা হচ্ছে। একটানা গন গন গন শব্দ। শব্দের মুখটা যেন ক্রমশ কাছে চলে আসছে। খেতের কাছে, যেখানে সাগর কাজ করছে, আর কিছুটা ফাঁকি দিতে দিতে হাত লাগিয়েছে তারার মাতলা শ্বশুরও।

একটা ছোট ছেলে দু'হাত তুলে চেঁচাতে চেঁচাতে আসছে— রণগাড়া আলা, রণগাড়া...

রণগাড়া মানে যুদ্ধের ট্যাঙ্ক। কেউ হয়তো বালককে এইভাবেই বুঝিয়েছে। তারা টেলিভিশনের পর্দায় ট্যাঙ্ক দেখেছে। গণতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজে মাটিতে ট্যাঙ্ক চলে, আকাশে যুদ্ধবিমান। গণতন্ত্র দিবসের সঙ্গে এগুলোর সম্বন্ধ ঠিক স্পষ্ট হয় না তারার কাছে। গণতন্ত্র মানে তো ভোট! পঞ্চায়েত ভোট, জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি, এমএলএ-এমপি নির্বাচন। দলবেঁধে রঙিন শাড়ি পরে ভোট দিতে পেছোন কার্ড হাতে তুলে নিয়ে ক্যামেরায় মুখ দেখানো। তার মধ্যে আবার রণগাড়া— মানে ট্যাঙ্ক কোথা থেকে আসে? গন গন শব্দটা কাছে চলে আসছে। এটা হল আখ কাটাইয়ের মেশিন। দেখতে কিছুটা ট্যাঙ্কের মতন, আবার অনেকটা আলাদা রকমও। যেন একটা দাঁড়াওয়ালা মাকড়সা, সামনের চারটে স্টিলের পা ঘুরতে থাকে, আর মাটি থেকে উপড়ে তুলে নেয় আখের ফসল। সেটা আবার মেশিনের পিছনের লম্বা চোঙের মধ্যে কাটাই হয়ে পাতা আলাদা হয়ে জমা হয়ে যায়। ট্রাকটর দাঁড়িয়ে থাকে কাছে। মেশিনটা কাটা আখ উপরে দেয় ট্রাকটরের উপর। কাল, পরশু দু'দিনই গিয়ে কাছের খেতে দেখে আসছে ওরা— মেশিনে কেমন আখ কাটাই হচ্ছে, মানুষ ছাড়াই। তবে ট্রাকটর বোঝাই আখ দেখে ওদের ভালো লাগেনি, কাস্তে দিয়ে কাটা আখগুলোর কেবল ডগা ছাঁটা হয়, শরীরটা থাকে সতেজ সবুজ, কিন্তু যন্ত্রে কাটা আখগুলো কেমন কালো কালো, ছিবড়ে ছিবড়ে— যেন কোনও প্রাণ নেই আর ফসলের! সাখর কারখানায় এর পেষাই কী করে করে কে জানে! তবু তো মালিকের জেদ! মালিক মানে মহাবীর সাখর কারখানার মাথা তাদের শ্রীরাম পাটিল। স্থানীয় এমএলএর চেয়েও যার টাকা আর কব্জির জোর বেশি!

এবার নাকি মুকদম মানে ঠিকাদাররা— যারা দাদন দেয় আখ কাটাই মজদুরদের— কারখানা থেকে আগাম নিয়েছিল— কিন্তু যথেষ্ট মজদুর আসেনি। মুকদমরা বলছে, ওরা টাকা নিয়েছে, নিয়ে পালিয়েছে, কিন্তু কাটাইয়ে আসেনি। মজদুররা বলছে, কার ঘাড়ে কটা মাথা যে টাকা নিয়ে পালাবে? টেনে এনে বেঁধে মেরে দেবে মুকদম, তারা পুলিসের চেয়েও বেশি ক্ষমতা রাখে, পুলিস তো তাদের হাতেই। আসলে টাকা ঠিকেদাররাই হজম করেছে, কারখানাকে ঠকিয়েছে। এটা সত্যি যে কার্তিকে একপশলা বৃষ্টি হয়েছিল মারাঠওয়াড়ায়— অনেকটা অলীক কল্পনার মতো— তাতেই সয়াবিন, চিনেবাদাম বুনে বসে আছে কিছু চাষি— যারা গত তিন বছরে রবি ফসল বোনার সুযোগ পায়নি। কিন্তু টাকা আগাম নিয়ে, কাটাইয়ে না আসার মতন হিম্মত তাদের কারওরই হবে না।

পুরোটাই হয়তো একটা মনগড়া গল্প। সাগর বলেছে মিনুকে— মালিক ঠিকেদার মিলে একটা গল্প তৈরি করেছে যে এবার মজদুর বেশি আসেনি। আখ কাটাই শেষ হতে অনেক দিন লেগে যাবে, খাড়া ফসল নষ্ট হবে— তাই মেশিনের বরাত দেওয়া হয়েছে। একটা-দুটো নয়, পনেরোটা মেশিন কাজ করছে

মহাবীর কারখানার আশপাশের জমিতে। শ্রীরাম পাটিল নাকি মেশিন কোম্পানির মাথাকে ডাকিয়েছেন বম্বে থেকে, বলেছেন, আগামী বছর কাটাই-এর মরশুমে আরও পঁচিশটা মেশিন লাগবে। দু'কোটি পঁচিশ লাখ— একটা মেশিনের দাম— তবেই দেখো, কত টাকা খাটাচ্ছে মেশিনে!

গত দু'দিন ধরে আখের যে বিরাট খেতটা সাগর-তারা ওদের পড়শিরা মিলে হাতে কেটে সাফ করেছে, কাটতে গিয়ে ওদের হাত ছড়ে গেছে, কালো হয়ে গেছে ধুলো-মাটিতে, চামড়ার ফাটে জমেছে কালি, জুতোর হাইতে পায়ের গুলি ফালাফালা হয়ে গেছে, ওরা সবাই হাত মানবে না বলে গলা পর্যন্ত আঁটা মোটা পুরো হাতা জামা, ফুল প্যান্ট আর ঘাঘরার মতো পেটকোট— সেইরকম একটা খেত দৈত্য মেশিনটা সাবার করে দিচ্ছে দু'ঘণ্টায়। তার ঘন ঘন শব্দে কান পাতা দায় হয়ে উঠেছে। মেশিনের উঁচু ল্যাজের দিকটা থেকে ফোয়ারার মতো ভলকে ভলকে বেরিয়ে আসছে খণ্ডপিষ্ট আখের গুঁড়ো, তার দাপটে কাশির দমক আসে কাছেপিঠে কাস্তে চালানো মানুষদের। এত মেশিন এলে কয়েক বছরে তাদের আর কাজ থাকবে না, অথবা জবরদস্তি আগাম টাকা কমিয়ে দেবে মুকাদমরা— তখন?

দেশাস্তরী মজদুর নিজের ভিটেমাটিতে বসেই শুকিয়ে মরবে। এটাই ওরা চায়। ওরা মানুষদের চায় না। এই সাখর কারখানাগুলো। নামেই এরা সমবায়। আসলে এরা চল মালিকের ইচ্ছেতে। মানুষের হাজার ঝামেলা। মেশিনে তেল ভরো, চালাও কয়েক ঘণ্টা শুধু। তবে আমরাও ছাড়ব না। আন্দোলন গড়ে তুলব। কাটাই মজদুরদের সংগঠন হবে। মারাঠওয়াড়া জুড়ে জমায়েত করব।

রাতের খাওয়ার পর কাজে বেরবার আগে সাগর বলছিল মিনুকে। মিনু তখন শুনেছিল, পুরোটা ধরতে পারেনি। এখন মেশিনের গর্জনে মনে পড়ল আবার। দোলায় শোওয়া মেয়েকে নিয়ে স্বপ্ন দেখা কি তার সাজে?

সন্ধের সময়টা মিনুর বড় মন কেমন করে ফেলে আসা গ্রামের জন্য। সত্যি জল নেই, বৃষ্টি নেই, অন্নের সংস্থান নেই। তবু ছেলেমেয়ে দুটো আছে। শাশুড়ি যদিও যথেষ্ট ভুগল দিয়েছেন প্রথম সন্তান হবার কালে, তবু বুড়োমানুষ তিনি, ঘর সংসার দেখেন তাঁর জন্য মন কেমন করে। ঘরে দুটো গোরু আছে মিনুদের। দুটো মোষ, মুরগি আর ছাগল, তাদের সবাইকে মনে পড়ে এই টেলির মাঠে দাঁড়িয়ে।

দূর পাহাড়ের মাথায় যেন আগুনের মালা— সন্ধে নামছে টেলির মাঠে। সহ্যাদ্রি পর্বতশ্রেণীর চূড়ায় লাল টকটকে সূর্য, ঢেউ খেলানো সবুজ পাহাড় নয়, বৃক্ষহীন, হলুদ ঘাসে আকীর্ণ জ্যামিতিক রেখায় আঁকা দীর্ঘ পর্বতমালা। একের পিছনে অন্য, এইভাবে গাঢ় নীল থেকে ঈষৎ ধূসর, নানা স্তর দেখা যায় আকাশের সীমারেখা পর্যন্ত। মেয়েরা তাদের সঙ্গের ছোট শিশুরা দিনের শেষে ছই কয়লা দিয়ে ঘষে অল্প জলে বাসন ধুচ্ছে। একটিই জলের কল। লাইন নিয়ে, জলের পাত্র বসিয়ে জল আনতে হয়। বাতাসে চিনিকলের মোলাসেস-এর গন্ধ ভাসছে। ছ'টার সময় বেজে গেছে কারখানার শেষ ভোঁ। সারাদিনের শেষে রান্নার উনুন জ্বলেছে। শ্রান্ত, ধূলিধূসর, অগোছালো টেলিতে এও যেন এক উৎসবকাল। কোনও শ্রী নেই বসতওলিতে। কোথাও আখ ও মাটির ঢিবি পড়ে আছে, কোথাও খালি বৈল গাড়ি, বলদরা, মোষেরা চরছে, জাবনায় মুখ দিয়ে খাচ্ছে। কাপড় কেচে খোঁটায় টাঙিয়ে মেলে দিয়েছে মেয়েরা। ভিতরে পায়ে চলা পথ নেই, গাছ-গাছালির সবুজ নেই, এ যেন এক মানুষের তৈরি নির্বাসনভূমি। ভোর চারটে, কখনও তিনটের সময় মেয়েরাও যায় আখ কাটাইয়ে। তাই সন্ধেই তাদের একমাত্র রান্নার সময়। রাতের দিনের রান্না একই সময় করে রাখে। সকালে এত রোদ উঠে যায় যে কোনও কাজ করা যায় না। খোলা মাঠে মাথায় পিঠে সূর্য বর্ষায়। আড়াল-আবডাল নেই যে কোনও। গ্রামে যেমন, টেলিতেও তেমন বাইরের কাজের সঙ্গে সঙ্গে ঘরকেও ধরে রাখে মেয়েরা। অথচ দেখো, তাদের নাম কিন্তু কোথাও নেই!

ঘরে নয়, জমিতে নয়, বলদে নয়,
ফসলে নয়,
বাসনে নয়, কোসনে নয়,
আমরা তবে কই?
বলদ মরলে বিমা আছে, চাষি কাঁদবে,
মেয়ে মানুষ মরলে?
ধ্বক ধ্বক ধ্বক ধ্বক

আখ বোঝাই ট্রাকটর আসছে খেত থেকে, কারখানা যাবে, এখানে নামিয়ে দিয়ে যাচ্ছে কয়েকজন। টেলির ঝুপড়িগুলির মাঝখান দিয়ে এটাই তাদের শর্টকাট— তার বাচ্চা কোলেই থাকে, নয়তো ঝুলানো— হামা দেওয়ার বয়স হয়নি, হাঁটার তো নয়ই—

তবু চমকে পিছনে তাকায় মিনু। সন্ধের অন্ধকার, মাঠের মাঝখানে একটিমাত্র টেঙে টাঙানো বড় বাড়ি— তার আলো দশ ফুটের বেশি ছড়ায় না। ট্রাকটরের চাকায় এমন টেলির মাঠেই কবে মারা পড়েছিল কার ছোট বাচ্চা, মিনু শুনেছে। সেই থেকে অন্ধকারে ট্রাকটর চলার আওয়াজে তার বুকের মধ্যে হাঁপ ধরে।

রাস্তা পেরলে, ওপারে একটা খালি, ন্যাড়া আখ খেতে আগুন ধরিয়ে দিয়ে বাড়ি গেছে ওতে। ওতে গোড়া পুড়ে ছাই হয় আখের, ছাই জমলে মাটি উর্বরা হয়। এখন সে আগুন জ্বলছে মহানন্দে, বাতাস লেগে তেড়ে তেড়ে উঠছে তার কমলা রঙের শিখা। ছাই উড়ছে বাতাসে। খেত জ্বলার এই ছবি, অন্ধকারে, মিনুর মনে ভয় ধরায়, কেমন যেন হতাশ, নিঃস্ব মনে হয় ওর নিজেকে। এই সময় সাগরকে খুব দরকার হয়। সাগরকে খুঁজতে চলে ও।

॥ চার ॥

ফেলে আসা গ্রাম

টেলি কে টেলি গ্রামে ফিরে এসেছে। এবার কিছু দেরিতেই ফিরেছে তারা, ভরা গ্রীষ্মে। অন্য বার আখের মরশুম শেষ হয়ে যায় চৈত্রের মাঝামাঝি, সাখর কারখানাগুলিতে আখ মাড়াই শেষ হবার একটি বিশেষ ঘণ্টা বেজে ওঠে, খার মানে, এবারের মতো মরশুম শেষ। এবার ঘণ্টা দেরিতে বেজেছে। বৈশাখের শেষে। আখের ফলন ছিল বেশি, তুলনায় মারাঠওয়াড়ার মজদুর এসেছে কম, রবি চাষের সময় অকাল বর্ষণ দেখে যারা উল্লসিত হয়ে নেমে পড়েছিল নিজের নিজের আখ অথবা জোয়ারের চাষে, তারা আসেনি না আসার ফল ভালো হয়নি কোনও দিকেই। যে বর্ষার ভরসায় সেচহীন জমিতে তারা ফসল বুনেছিল, তার চিহ্ন মিলিয়ে গেছে শীতের দিন গড়িয়ে বসন্তের দিকে আসতেই। মালিকরা অসন্তুষ্ট চিনিকলে। মুকাদমরা নালিশ করেছে, দাদনের টাকা, যাকে এ অঞ্চলে বলে 'উচল' তা নিয়েও অনেকে আসেনি, অনেক চেনা মজদুর উচল নেয়নি। কাজেই চিনি কারখানার কাছে মুখ পুড়েছে মুকাদমদের।

শ্রমিক কম থাকার জন্য চিনিকলগুলি কেউ কেউ আখ কাটাই মেশিন এনেছে। অন্যদের জন্য দীর্ঘ হয়েছে ফসলের মরশুম— কাটাই চলেছে বেশি দিন ধরে।

এমনিতেই এ কাজের কোনও বাঁধাধরা ঘণ্টা নেই, সারা দিন রাত কাজ চলে। 'কইতা' চালিয়ে ঘাড়, হাত, মাথা টনটন করে। কাটা আখের বোঝা দু'হাতে তুলে ট্রাক্টরে ভরতে অমানুষিক কষ্ট। তার ওপর এবার কাটাই চলেছে চৈত্র-বৈশাখের খর তাপে। বৃষ্টিহীন, ধূলিওড়া, রোদ— তাতে কয়েক মিনিটের বেশি দাঁড়ালে তালু শুকিয়ে আসে, গলা বুক খাঁ খাঁ করে, মনে

হয়া মুখ থুবড়ে পড়ে যাবে মানুষ। কিন্তু কেউ পড়ে যায় না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজে যেতে পারে— পড়া পোষাবে না। 'উচল' এর টাকার শেষ পয়সা পর্যন্ত শোধ না হওয়া অবধি রক্ত-ঘাম দিয়ে কাজ করে যেতে হবে মজদুরকে। মারাওয়াড়া থেকে যারা এসেছে, তারা সবাই চিনিকলের কাছে, আখ চাষির নজরে— মজদুর। তিন, পাঁচ, দশ একর— যার যা জমি থাক কিংবা পাকা বাড়ি সেচইনা মারাওয়াড়ার ওসব জমির কোনও দাম নেই। জমির মালিক, ভূমিহীন, প্রান্তিক চাষি— পশ্চিম মহারাষ্ট্রে এসে পড়লে সকলেই মজদুর।

এই রোদ্দুরে পোড়া জমি পিছনে ফেলে রেখে নিজেদের গ্রামে ফিরে গেছে মানুষরা। কোথাও টোলি বসেছিল হাইওয়ের ধার ঘেঁষে, খোলা মাঠে। সেখান থেকে খুলে নেওয়া হয়েছে গাই-বলদের খোঁটা, বাঁশের ছাউনি, সরে গেছে বলদ গাড়ি। চাষিদের কাছে ফিরে গেছে সেগুলি। আখ পাতায় ছাওয়া ঝুপড়ি ঘরগুলি টেনে নামানো হয়ে গেছে। গ্রামে ফিরে যাওয়ার আগে মেয়েরা আখের শুকনো সবুজেট পাতাগুলি আঁটি বেঁধে সঙ্গে নিয়ে গেছে— জ্বালানি হবে রান্নার।

মাঠে ইতস্তত পড়ে আছে হলুদ খড়খড়ে পাতা, আখের ছিবড়ে, কালো হয়ে যাওয়া, তোলা উনুনের গর্ত আর ওদের গত সাত-আট মাসের ক্ষীণজীবী ঘরকন্নার কিছু অকিঞ্চিৎকর জিনিস— ছোট ছেলেমেয়েদের ভাঙা খেলনাপাটি, মেয়েদের চুলের দড়িদড়া, চিরুনি, তোবড়ানো কড়াই, হাঁড়ি, মাটির বাসনপত্র। এখানে যেন দীর্ঘ দীর্ঘ এক মেলা বসেছিল, মেলার পসারিরা উঠে চলে গেছে পরবের শেষে। হাইওয়ের ধারের সপাট, সমান মাঠগুলিতে সেইসব মজদুরেরা ছিল যাদের অবস্থা একটু ভালো। তাদের বলদ আছে, গাই আর ছাগলও। সেই জন্য দাদনের দর তাদের বেশি, আর তাদের টোলিতে অন্তত একটা উঁচু বিজলি বাড়ির থাম, জলের কল, ট্রাক্টর চলাচলের পথ আছে। কিন্তু যারা একেবারেই ভূমিহীন, সঙ্গতি শূন্য, তাদের গাই-বলদ-পশু কিছুই নেই, সঙ্গে আনার মতো তাদের মুকাদম নিয়ে এসেছে ট্রাকে অথবা ট্রাক্টরে চাপিয়ে, তাদের টোলি বসেছে যে সব খেতের আখ তারা কাটবে তার আশপাশ ঘিরে। এবড়ো-খেবড়ো অসমান মাটিতে আখপাতার ছাউনি, আলো নেই, নেই পানের উপযুক্ত জল। শৌচগার, মেয়েদের স্নানের জায়গা— এসবের তো প্রশ্নই ওঠে না। সে সব তো অন্য টোলিতেও নেই। রাতের বিশ্রামের মধ্যেও এরা শোনে আখ বোঝাই ট্রাক্টরের যাতায়াতের শব্দ, মেশিনে কাটাই-এর ঘড় ঘড় আওয়াজ, পানীয় জলের বদলে আজলা ভরে বর্জ্য আখের 'বাঁড়' পান করে এদের গলা জ্বলে যায়। যে কোনও সময় মুহূর্তের ভুলে জ্বলে ছাই হয়ে যেতে পারে তাদের পাতার ছাউনি— এ কথা তাদের মনে থাকে না। খেতের মধ্যে দু'খেপ যাওয়ার মধ্যেই তাদের মেয়েরা মোটা মোটা বাজরা বা জোয়ারের রুটি তাওয়ার উপর হাতে গড়ে সেঁকতে থাকে। এভাবেই এরা থাকে, কারণ আগাম নেওয়া টাকা শুধতে হবে। গ্রামে তো ফিরে যাবে একদিন, শরীরের সব রক্ত জল হয়ে গেলে, এই ভাবনাই তাদের সঞ্জীবিত করে রাখে।

গ্রামে ফিরে এসেছে ওরা। সাখর কারখানা বা চিনিকলের আশপাশের গ্রামের লোকজন, বউ-ঝিয়েরা বড় রাস্তার ধারের পাড়াগুলি থেকে উঁকি মেরে দেখেছে একের পর এক ট্রাক্টর, বলদ গাড়ি, ট্রাকে করে তিন জেলা থেকে যারা কাজ করতে এসেছিল, তারা ফিরে চলেছে। বলদের গলায় ঘন্টা বাজছে টং টং। ট্রাক্টর চলছে বকে বাক্ বকে, তার বনেটে, সেল লাগানো ট্রেলারে মানুষজন বসে। ট্রাকে, মিনি ট্রাকে গাদা হয়ে তারা ফিরছে, যাদের ফেরার অন্য কোনও ব্যবস্থা নেই।

আট মাস গ্রামের বাইরে থেকে ঘরে ফেরা— সেও এক অন্যরকম গল্প। যতদিন কর্মক্ষম পুরুষ-মেয়ে-যুবক ছেলেরা, ছোট শিশুরা টোলিতে দিন কাটাচ্ছিল, গ্রামে পড়েছিল অশক্ত বুড়ো-বুড়ি, কিছু তরুণী-কিশোরী অবিবাহিত মেয়ে— যাদের বাবা-মা সঙ্গে নিতে চায়নি। বাড়ির বুড়ো-বুড়িদের সঙ্গেই থেকেছে মেয়েরা। ছেলেপুলেদের মধ্যে পড়াশুনোর প্রতি যাদের টান বেশি, তারা স্কুলের ঘরগুলিকে হস্টেল বানিয়ে থেকে গেছে, দু'একজন শিক্ষক থেকেছে তাদের সঙ্গে। গ্রামের অবস্থা কিন্তু ভালো নয়। চিনি কারখানার শেষ ঘণ্টা শোনার পর শ্রীহীন বিষণ্ণ নিজভূমে ফিরে মজদুরদের মন ভালো হয়, না খারাপ, বোঝা শক্ত।

অধিকাংশ বাড়ির অবস্থাই বেশ রংচটা, পলেস্তারা খসা। যারা গ্রামে ছিল সেই বয়স্ক মানুষেরা কোনওমতে সংসারটুকু চালিয়ে নিয়েছে, বাড়ির দেখাশোনা করে উঠতে পারেনি। ঘরদোর ঝাঁটপাট দিয়েছে— কিন্তু পথ-ঘাট পরিষ্কার হয়নি এত মাস। বৃষ্টিহীন অঞ্চলে ধুলো বেশি। বাতাসে ধুলো, প্লাস্টিকের ঠোঙা, ফসলের খোসা, বাজরা ও জোয়ারের খড়ের টুকরো উড়ে বোঝাই হয়েছে পথের ধারে। সন্ধের মুখে কোলের মেয়েটাকে নিয়ে পাড়ায় বেরিয়ে নকোশির মনে হল, কেমন যেন থম মেরে গুঁড়ি মারা জন্তুর মতন বসে আছে তাদের গ্রামটা। জন্তুরই মতন বোটকা দুর্গন্ধ তার সারা গায়ে। স্নান না করা মানুষেরও যেমন হয়। গণপতি মন্দিরের সামনের ফাঁকা জায়গাটায় পরাজিত সরপঞ্চ তথা মুকাদম রাজেন্দ্র চাটাই পাতার ব্যবস্থা করছে। কী হবে গো রাজেন দাদা! নকোশি মিঠে গলায় জানতে চায়।

দয়া তাঈ আসছেন। একাই থাকো, দুরে যেও না। রাজেন্দ্র গঙ্গীরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মানুষগুলো আপন মনে গজর গজর করছে, বিল বিজ করে কথা বলছে। বাতাসে ঝগড়ার ঘ্রাণ। রাজেন্দ্র ছাড়া হাতে গোনা ক'জনকে ছেড়ে দিলে বাকি সবাই চোলাই খেয়ে টং হয়ে আছে। দয়া তাঈ-এর সামনে উল্টোপাল্টা কিছু বলে বসলে মুশকিল হবে তো!

পুরুষগুলোর কী যে অপরিষ্কার স্বভাব। যেখানে বসে আছে, সেখানেই থুত ফেলছে। একবার নয়, দশ-বিশবার। এতে যে জীবাণু ছড়ায়, রোগ-ব্যাধি হয় ওরা কি জানে না? গরম খুব তবু নিজের আঁচল দিয়ে বাচ্চাটার মাথা ঢাকার চেষ্টা করে নকোশি। এমনিতেই তো বর্ষার জল পায় না তাদের গ্রাম সাঙ্গেবাড়ি। তার ওপর ইঁদারাগুলি শুকিয়ে গেছে। ধুলোর উপর কফ-থুতু পেচ্ছাপ বাহ্য তার উপর আরও ধুলোর পরত। সব মিলিয়ে দুর্গন্ধের একটা পুরু সর পড়ে গেছে। এত দিনের পুরনো বসত, বড় চাষি, ছোট চাষি, মজদুর কারও ঘরে কল-পায়খানা নেই। কেউ বানাবে না। পয়সা যদি সরকার পুরো দেয় হাতে তো হবে, নইলে নয়। কেন বানাবে? আট মাস তো এখানে থাকিই না— মাথার উপর ছাদ আছে একখানা ওই ঢের! গ্রামসেবকও তেমন। কার কার নামে পায়খানা বানাবার টাকা এসেছে সে সব জানে। রকের সঙ্গে যোগসাজশে টাকা তুলে মিছেমিছি দেখিয়ে দিচ্ছে এতগুলো তৈরি হয়েছে। সবটাই ভুয়ো। নকোশির কেমন যেন প্রাণ আনচান করে এখানে। তার বাপের বাড়ি গ্রাম এখান থেকে তিরিশ কিলোমিটার দূর আম্বালিম্বাতে। ওখানে স্কুলে টেন ক্লাস পর্যন্ত পড়েছিল নকোশি। স্কুলে কল-পায়খানা ছিল।

ওদের মজবুত ক্লাস টিচার ঠোমরে দিদিমণি ছেলেমেয়েদের বাথরুম কীভাবে পরিষ্কার রাখতে হয় শিখিয়ে দিয়েছিলেন হাতে ধরে। ও গাঁয়ে অত মানুষ আর কাটাইয়ে যেত না। ওর বাবা কয়েক বছর গেছে। তারপর অবস্থা একটু শুধরোলে গ্রামের জমিই চাষ করত বাবা। নকোশি কি কখনও ভেবেছিল, সেও একদিন আখ কাটাই টোলিতে যাবে বলদ গাড়ি চড়ে? বর, শ্বশুর, শাশুড়ি সবার সঙ্গে? কেন যে তার সাঙ্গেবাড়ির মতো হাঘরে গ্রামে বিয়ে হল— যেখানে শা'এর মধ্যে নব্বই ঘর আখ কাটাই মজদুরি করতে যায়! বাবা মারা গেল ফুসফুসের অসুখে হঠাৎ, জমানো টাকা হু হু করে বেরিয়ে গেল। আর মা, ছোটভাই

সবাই মিলে নকোশিকে পাঠিয়ে দিল বিয়ে দিয়ে সাঙ্গেবাড়ির মতন একটা শুকনো, দুর্গন্ধভরা, ধুলোট গ্রামে। হবে না কেন! যতই পড়াশুনো করুক, তার নাম যে 'নকোশি'। দুই মেয়ের পর তিন নম্বর মেয়ে। কেবল পুরুষ হয়ে জন্মেছে বলে ছোট ভাইটাও এমন ভাব দেখায় যেন, বাবার পর সংসারে কর্তা সে-ই, মা নয়!

দয়া তাঈ এলে আবার একটা গণ্ডগোল বাঁধবে। গ্রামের মেয়েরা, বউরা জুজুবুড়ির মতো হয়ে দল পাকিয়ে বসে আছে। মাসখানেক হল ওরা ফিরেছে, সবার ঘরে জলের কষ্ট, আজকাল তিন চার কিলোমিটার হাঁটতে হচ্ছে রোদে, খাবার জল আনতে, তবু কেউ নড়ে বসবে না। আসুক দয়া তাঈ। যেদিন থেকে ফিরেছে, পুরুষরা জমে গেছে মণ্ডপে জুয়ার আড্ডায়। বিকেলের পর থেকে ভাঁড়ে ভাঁড়ে দেশি মদ চলে চায়ের মতন। কেউ কোনও কাজ করবে না। না সংসারের, না বাইরের, 'উচল' পেয়েছিল যে টাকা, তার যতটুকু বাকি আছে, ভেঙে ভেঙে খেয়ে চলেছে! এই যে মেয়েরা ঘর সামলাচ্ছে, রাঁধছে, বাসন মাজছে, জল আনছে, জ্বালানি জোগাড় করছে, সব যেন ওদের ফুর্তিতে রাখার জন্য। কেউ নড়ে বসবে না, কেউ কুটোটি ভাঙবে না।

প্রথম প্রথম এসব বুঝতে পারত না নকোশি ওরফে মিনু। দয়া তাঈ-এর কথা শুনতে শুনতে তার ভিতরটা বদলে গেছে। এককালে যা সয়ে যেত, এখন তা চোখে দেখলে অ-সওয়া লাগে। কষ্ট হয়। রাগ হয়। আগে মুখ বুজে যা শুনত, এখন তা আর শোনে না। উত্তর দিয়ে দেয় মুখের ওপর। ঝটাপট। থালার উপর পাঁচ-ছটা কাপ সাজিয়ে চা আনছিল ইন্দুমতী। দয়া তাঈ রেগে এমন চেঁচিয়ে উঠলেন, ওর থালায় চা চলকে পড়ে সব কাপ অর্ধেক খালি হয়ে গেল। বেশ হয়েছে। নটী মেয়ে ইন্দুমতী। সাজুগুজু মেয়ে। বেশ ধারালো সুন্দর মুখখানা, মস্ত খোঁপা হয় লম্বা চুলে, বেতের মতো ছিপছিপে গড়ন— কে বলবে ও তিন মেয়ে এক ছেলের মা। দয়া তাঈ-এর নাটকের দলে নাটক করে ইন্দু, গানের গলা ওর কান পেতে শোনবার মতো। আশাকর্মীর কাজ করে। তবে সারা বছর তো কাজ থাকে না, কেস আনলে টাকা পায়। দয়া তাঈ এলে ইন্দু এক মিনিট কাছ ছাড়া হবে না, চোখে হারাচ্ছে ওঁকে যেন। ওকে বকুনি খেতে দেখে নকোশির ভালোই লাগল। না, না, তা কেন! ইন্দু ওর ভালো বন্ধু। এ গাঁয়ে আর কটা মেয়ে আছে যার সঙ্গে নাকোশি কথা বলতে পারে প্রাণ খুলে!

দোষ তো ইন্দুর নয়। নকোশি জানত, দয়া তাঈ এসে পৌঁছলে এমন একটা কাণ্ডই হবে। দয়া তাঈ-এর বড় গাড়িটা এসে পৌঁছলে তিড়িং বিড়িং করতে করতে বড় ছাগলগুলো দৌড়েছে। পিছন পিছন স্কুলের ছেলে-মেয়েগুলো। স্কুল এখনও খোলেনি। সারাদিন দুষ্টুমি ছাড়া কোনও কাজ নেই ওদের। খুব একটা লম্বা নন দয়া তাঈ, মাঝারি গড়ন, খুব লম্বা চুল, বেণী করে রাখেন। সালোয়ার কামিজ ক্যানভাসের জুতোয় জোরে জোরে হাঁটেন। চাটাই পাতা থাকলে ভালো, না হলে নিজের বড় খাতা আর কলম নিয়ে মাটিতেই বসে পড়বেন তাঈ। তাই আগেভাগে ব্যবস্থা করে রাখতে হয়। হ্যাঁ সরপঞ্চ রাজেন্দ্র চাটাই পেতে রেখেছে। জেতা সরপঞ্চ ভৈরবকে ডাকলেন তাঈ। যুবক মানুষ, ফ্যাশন দুরস্ত, চোখে কালো চশমা, কিন্তু কোনও কাজের নয় বোঝা যাচ্ছে। প্রথম প্রশ্নেই আউট হয়ে গেল।

নাক কুঁচকে, ভুরু তুলে দয়া তাঈ জানতে চাইছেন— এত ময়লার ঢের কেন? মন্দিরের সামনেটায়? এই কোণে?

মন্দিরের সামনের চওড়া চাতাল মতন জায়গাটা বাঁহাতে একটা সরু গলি হয়ে গেছে। সেখানে পুরনো ভাঙা স্কুল বাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে, ওখানে স্কুল হয় না আর। নতুন স্কুলটা, প্রাইমারি, একতলা, মন্দিরের পাশ ঘেঁষে। গাছগুলোও কেমন যেন জীবনহারা, নিষ্পত্র, যেন বাজের আগুনে বলসে কোনও মতে দাঁড়িয়ে। ভৈরব বেশ সবজান্তাভাবে বলল, ময়লা তো স্কুল

উন্নয়নের পথে মানুষের সাথে

সকলকে জানাই শুভ শারদীয়া ও

দীপাবলীর প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

সৌজন্যে ঃ

বালি জগাছা পঞ্চায়েত সমিতি

খালিয়া, চামরাইল, হাওড়া

খুললেই পরিষ্কার হয়ে যাবে— একেবারে ঝক্কাস—

মানে? চশমার ফাঁক দিয়ে ভৈরবের দিকে তাকালেন দয়া তাঙ্গী। ছেলেটা ঝকমকে কালো হলুদ শার্ট পরেছে সিল্কেটিক, সামনের তিনটে বোতাম খোলা। স্কুলের সঙ্গে ময়লার সম্পর্ক কী? ভৈরব, যেন দারুণ বুদ্ধির কাজ করেছে, এমন মুখ করে বলল— স্কুল খুলে গেলে বাচ্চারা আসবে। তারপর ওরাই সাফ করবে সব ময়লা। স্কুল বন্ধ থাকলে সাফ হয় না—

মানে? তোমাদের বাড়ি-ঘর ওরাই পরিষ্কার করে বুঝি?

এবার ভৈরবের মাথায় কিছুটা ঢুকেছে ব্যাপারটা।

বাড়ি-ঘরের ভিতরটা তো আমরাই করি! কিন্তু এসব রাস্তার ময়লা তো বাতাসে নিতি উড়ে আসছে। কত আর ঝেঁটাব? আর পরিষ্কার করলে কাল আবার ময়লা হবে। তাই ও সব বাচ্চারাই সাফ করে, তাঙ্গী।

এতেও যেন যথেষ্ট হয়নি, এরপর বউ আর বুড়িরা পেছন ঘষটে ঘষটে দয়া তাঙ্গী-এর সামনে এসে গুন গুন করতে লেগেছে— এই গরমে দেড় দু'মাইল হাঁটি, জল আনতে, গ্রামে জল নেই এক ফোঁটা—

তাঙ্গী-এর ভুরু কুঁচকোয়।

গত বছর যে মোটর আর পাইপ লাইন বসিয়ে দিয়েছিলাম, লাখখানেক খরচ করে, সেটার কী হল?

কলের মাথাটা কেউ ভেঙে নিয়ে গেছে তাঙ্গী। মোটর থেকে পাইপের জোড় খুলে নিয়েছে, ওটাও বোধহয় ভেঙে নিতে চাচ্ছিল, পারেনি—

তোমরা নিশ্চয়ই জানো, কে ভেঙেছে? কারা ভেঙেছে? তোমাদের মধ্যে নেশাড়ুরা ভেঙে নিয়ে গেশা করেছে। কিন্তু সবাই মিলে চাঁদা তুলে সারাতে পারলে না পাইপ আর কলের মাথাটা— অথচ মেয়েরা রোজ এতটা পথ হাঁটতে রাজি?

এই সময় চা আনতে গিয়ে বকুনি খেল ইন্দুমতী। দয়া তাঙ্গী চেঁচলেন— রাজেন! বেকুব! একজন ভোটে হেরেছ, পঞ্চায়েতে আর একজন সবে জিতেছ। তোমাদের কি কোনও লজ্জা নেই! মেয়েরা কীভাবে জল আনছে দেখতে পাচ্ছ না?

ইন্দু চায়ের থালা মন্দিরের চত্বরায় নামিয়ে রেখে করুণ চোখে তাকাচ্ছে। নকোশির হাঁসি পাচ্ছে, আবার দুঃখও হচ্ছে। ওরা দু'জনেই জানে, তাঙ্গীকে সবচেয়ে কষ্ট দেয় কী— মেয়েদের অবস্থা নিয়ে পুরুষদের কোনও মাথাব্যথা নেই এ অঞ্চলে। তারা কীভাবে রাঁধে, জল আনে, জ্বালানি আনে— বয়েই গেছে মরদদের ভাবতে। গ্রামে ফিরেছে আখ টেলি থেকে, এখন কেবল জুয়া, মদ আর টাকা ওড়ানো। আর রুটি গরম না পেলে, ডাল ঘন না হলে, জোয়ারের ভাক্‌রি ভালো স্যাঁকা না হলে বেধড়ক মারা। হ্যাঁ আর একটা কাজ আছে— একটা নয় দুটো— টেলিতে যাওয়ার আগে বউ-এর বাচ্চাদানী খসিয়ে নেওয়া আর পেটে বাচ্চা এলে জাঁচ করাতে বিড নিয়ে যাওয়া ক্লিনিকে— যদি মেয়ে সন্তান আসে তো তাকে জন্মের আগেই নিকেশ করা!

মেয়েদের জন্মের আগে নিকেশ করা নিয়েও কত রকম রাজনীতি! একটা দল আবার স্লোগান দিয়েছে— মেয়েদের যদি জন্মাতে না দাও, রুটি খাবে কার হাতের?

বোঝো কথা! এই স্লোগান শুনে তাঙ্গী-এর কী রাগ!

শালারা, তোমাদের রুটি খাওয়াব বলে জন্মেছি আমরা! তোদের পেটে রুটি পড়বে বলে আমাদের বাঁচিয়ে রাখতে চাস! বেজন্মা হতভাগার দল! দেখি তোরা কী করে ভোট পাস এ জেলায়!

তাঙ্গী যতই রাগুক, মেয়েদের হাতের রুটি খেতে চাওয়া সেই পার্টি কেবল এ জেলায় জেতেনি, জিতেছে দিল্লিতেও। মানুষ আজকাল এসব নিয়ে মাথা ঘামায় না ভোটের সময়। রাস্তা হবে, ব্রিজ হবে, ঝকঝকে উন্নয়নের ছবি ভাসবে চোখের সামনে, আখটোলির জীবন না বদলালেও ভোট দেবে মানুষ, দল বেঁধে, দেশের নামে কসম খায় যারা, দেশদ্রোহীদের জ্যান্ত পুড়িয়ে মারতে চায়, তখত তাদেরই। যে সব মেয়েরা জন্মায়নি, তাদের কি কোনও আওয়াজ আছে নাকি? মরলে মানুষ ভূত হয়, ভূতের আওয়াজ কেউ শুনেছে? যারা জন্মায়নি তারা তো ভূতেরও অধম! দুনিয়ায় পা-ই রাখতে পারেনি, তার আগে খসে গেছে পেট থেকে!

পশ্চিম মহারাষ্ট্রের সাতারা জেলার মেয়ে দয়া তাঙ্গী। অথচ গ্রামে এসে কথা বলেন বিড জেলার আর মারাওয়াড়ার ঠেট মারাঠিতে। যখন গলা তোলেন, মনে হয় গম গম করছে চারদিক। মাইকটাইক লাগে না। অতটুকু মেয়েমানুষের শরীর থেকে এমন আওয়াজ বেরতে পারে শুনে পুরুষরাও চুপ করে যায়, মাথা নিচু করে শোনে।

আজ পনেরো বছর হয়ে গেল তিনশো মাইল আর পাঁচ ঘণ্টার রাস্তা পেরিয়ে বিড জেলার এই তালুকা অঞ্চলে কাজ করছেন দয়া তাঙ্গী। যেখানে ওঁর বাড়ি। সেই শহরে কোর্টে ওনার প্র্যাকটিস, মামলা মোকদ্দমার কাজ থাকে। কিন্তু নানাভাবে উনি নিজের ওপর তুলে নিয়েছেন এক নতুন কাজ। শরাবের ভাঁটি তোলার কাজ— সে তো দশ বছরের বেশি হয়ে গেল নকোশির তখন বিয়েই হয়নি— ওর বর সাগর বলে দু'শোর ওপর বেআইনি মদ ভাটি বন্ধ করিয়েছেন দয়া তাঙ্গী— প্রথমে মেয়েদের সঙ্গে নেবেন, এক জোট করাবেন, তারপর খবর দেবেন পুলিশ আর এক্সাইজকে। মদ খেয়ে পুরুষ বাড়ি এসে মেয়েদের গায়ে হাত তুলবে, আর রান্নাঘরে লাথি মেরে উনুন উল্টে দেবে— মেয়েরা মুখ বুজে সইবে? কতবার তো এমন হয়েছে, পুলিশ মুখ ফিরিয়েছে। এক্সাইজ না জানার ভান করে অফিসে গ্যাঁট হয়ে বসে আছে। দয়া তাঙ্গী দমেননি। মেয়েদের নিয়ে ভাটি ঘেরাও করে বসে থেকেছেন সারাদিন, সন্ধে। তারপর লম্বা চিঠি দিয়েছেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে। তাইতে দৌড়ে এসেছে পুলিশ, এক্সাইজ।

অল্পবয়সি মেয়েদের বেআইনি বিয়ে। সে তো মারাঠওয়াড়ায় চলে আসছে বখে থেকে। ঋতুমতী হ'ল মেয়ে তো তাকে ছি ছি ঘেন্না করবে মা-বাপ দাদু-ঠাকুমা। বড় হয়ে গেছে মেয়ে, তার বিপদ এখন চারদিকে, ঘরে তার থাকা আর নিরাপদ নয়। স্কুলে গিয়েই বা কী হবে— পড়াশুনো শিখে কি মেয়েদের বিপদ কমেছে?

শিরুর কাসার তালুকার গ্রামে গ্রামে, মেয়েদের স্কুলে স্কুলে ঘুরেছেন দয়া যোশি বিয়ের অনুষ্ঠানের খবর পেয়ে সেখানে পৌঁছেছেন কয়েকজন সঙ্গী-সাথী, সাংবাদিক বন্ধু নিয়ে। এগারো বারো বছরের কচি মেয়ের বিয়ে হচ্ছে দোজবের চল্লিশের পুরুষের সঙ্গে। সানাই, ব্যান্ড, তাসা বাজছে। পাত্রপক্ষ, কন্যাপক্ষ কারও ভ্রুক্ষেপ নেই। আইনের কথা এদের কানেই ঢোকে না, কিন্তু মন, অনুভূতি, বিবেক? মেয়ের মা, মাসি, দিদিমা— এদেরও কি কিছু মনে হয় না? নাকি নিজেদের শৈশবসহবাসের লজ্জাজনক স্মৃতিকে ঢেকে ফেলতে চায় মেয়েকে বলির হাড়িকাঠে ঢুকিয়ে?

বিয়ের অনুষ্ঠানে দয়া যোশির অনুপ্রবেশ কেউ চায় না, স্বভাবতই। নেহাত অভদ্রতা করা যায় না শিক্ষিতা ওকালতি জানা শহুরে মহিলার সঙ্গে তাই, হাত জোড় করে মণ্ডপের বাইরে তাঁকে নিয়ে এসে চা খাইয়ে বিদায়। বিয়েটা যেন ভালোয় ভালোয় হয়ে যায়।

স্কুলে গিয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গে কথা বলেছেন। তাঁরা বলেছেন, আমাদের কোনও হাত নেই এ ব্যাপারে। বিয়েটা পারিবারিক। বাবা-মা বিয়ে দিচ্ছেন, এখানে আমরা কীভাবে মাথা গলাই। ক্লাসভর্তি মেয়েরা নতমুখ, চুপ। পূর্বজন্মের পুণ্য জন্ম নিয়ে পৃথিবীতে এসেছে তারা। এতটা বড় হয়েছে, খেতে

পরতে পাচ্ছে, স্কুলে পড়ছে— বিয়েটা তো একটা অনিবার্যতা, ভবিতব্য। আর কী-ই বা আশা করতে পারে মেয়েরা? সম্পন্ন ঘরের মেয়ের বিয়েতে ছাপা কার্ড থাকে, আমন্ত্রণ যায় নানা ভিআইপি'র কাছে। যাঁরা কখনও গ্রামান্তরে গিয়ে এসব বিয়ের নিমন্ত্রণ নেবেন না। তাঁদেরও জানানো হয় ডাক মারফত। নব্বই শতাংশ মেয়ের বিয়েই এ অঞ্চলে বালবিবাহ। দয়া যেশি প্রথম প্রথম দেখে অবাক হতেন, কার্ডে তিতিথি হিসেবে এলাকার এমএলএ বা এমপি'র নাম ছাপা। এও কি সম্ভব? পুরো ব্যাপারটাই যেখানে বেআইনি, সেখানে একজন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি উপস্থিত থাকছেন? পরে দেখলেন, এটাই দস্তুর। অন্নপ্রাশনে, বিবাহে ও মৃত্যুর পর দশম দিবসের ভোজে মানুষ জনপ্রতিনিধিকে চায়। আনন্দ-শোক সবকিছুর ভাগাভাগিরই রাজনীতি আছে। জনপ্রতিনিধিও চান না, যে তাঁর নামের পাশে অনুপস্থিতির 'ড্যারা' চিহ্ন পড়ুক। তাহলে তো পিছিয়ে যেতে হবে জনপ্রিয়তার দৌড়ে। দয়া যেশি বুঝলেন, এখানে এটাই দস্তুর। তারপর নিজের স্ট্যাটেজি বদলালেন। গ্রামের ছোটখাট জনসভায়, স্কুলে, পঞ্চায়েত ঘরে বলতে লাগলেন, বালবিবাহ আইনবিরুদ্ধ। যেসব এমএলএ এমপি বেআইনি কাজে হাজির থাকেন, তাঁদের যেন সামনের বার ভোট না দেওয়া হয়। এদের নামের লিস্টও বার করে দেওয়া হবে স্থানীয় কাগজে। হুমকিতে কিছুটা কাজ হল। এদের নাম ছাপা বন্ধ হল বিয়ের কার্ডে। কিন্তু রাজনীতির ঘোড়েলরা ভীষণ চটলেন দয়ার ওপর। ইতিমধ্যে দয়া বানিয়েছেন এক ফিল্মের দল। তিনি নিজে, দীপক, গ্রামের কয়েকজন যুবক-যুবতী এদের তালিম দিয়ে তৈরি হল আধঘণ্টার ছবি। সে ছবি দেখানো হচ্ছে গ্রামে গ্রামে, স্কুলে, মন্দিরের সামনের মণ্ডপ ঘরে। গাড়ির ব্যাটারি, বড় টেলিভিশনের স্ক্রিন সব মিলিয়ে চলমান প্রযুক্তির অভিযান। ছবি দেখে মা-কাকিরা, মেয়েরা দেখেন, শিক্ষক-শিক্ষিকারা ব্যবস্থা করে দেন স্কুলের হলঘরে— ধীরে ধীরে সাড়া পড়ে যায় জেলায়। ইতিমধ্যে ছবি ঘুরে এসেছে নানা রাজ্য, পুরস্কার পেয়েছে দিল্লির জাতীয় চলচিত্র উৎসবে। ছবিতে যেসব কিশোরী কাজ করেছে, কোনও অভিনয় না শিখে, জীবনে প্রথমবার তারাই হয়ে উঠেছে বালবিবাহ ঠেকাবার গোয়েন্দা দল। চারশোর ওপর বিয়ে বন্ধ হয়েছে গত পাঁচ-ছ'বছরে, মেয়েদের স্কুলে ফিরিয়ে নিয়ে গেছে টিচাররা। এও এক বিপ্লবের মহড়া। বালিকা বিবাহ ঠেকানোর পাশাপাশি আরও যে একটা কাজ দয়া তাঁকে করে চলেছেন বেশ ক'বছর ধরে, তা খুবই জরুরি, খুব গোপন। সে কাজের হদিস, নিয়ম, খবরাখবর জানে মাত্র হাতে গোনা কয়েকজন। বাকিরা খবর পায় একেবারে শেষ মুহূর্তে। এমনই কাজে সাগরকে জড়িয়ে নিয়েছিলেন দয়া তাঁকে, আর তার সঙ্গে মিশে গিয়েছিল নকোশি। নকোশিকে ওর নামের মানে, ইতিহাস বুঝিয়েছিলেন দয়া তাঁকে আর বলেছিলেন, 'নকোশি' যাতে 'নাহী শী' না হয়ে যায়, 'আর চাই না', মেয়েরা যাতে উধাও না হয়ে যায় সেই লড়াইয়েও শামিল হতে রাজি আছে কি না! বুক ঢিপ ঢিপ করে ছিল নকোশির, ভয়ে হাতের তালু ঘেমে উঠেছিল, এ কাজে রাজি হওয়া মানে বাঘের ঘরে প্রাণ হাতে করে ঢোকা, সাপে কিলবিল জলায় পা ডোবানো! কিন্তু সাগর সাহস দিয়েছিল, সঙ্গে করে নিয়ে যাবে বলেছিল। মাত্র কয়েক ঘণ্টার তো ব্যাপার। সত্যিকারের ঘটনা, আবার পুরো পুরি অভিনয়ও। সেদিনটা পুরো পাল্টে দিয়েছে নকোশিকে, আর কীভাবে যেন দয়া তাঁর খুব আপনার জন হয়ে উঠেছেন ওদের। নকোশি আর সাগরের।

॥ পাঁচ ॥

কত দূর আর কত দূর

মৌসুমি বায়ু যে বর্ষা আনে সারাদেশে, মারাঠওয়াড়ায় তা পৌঁছতে আষাঢ়ের মাঝামাঝি পেরিয়ে যায়। জৈষ্ঠের শেষ নাগাদ মালাবার উপকূলে বৃষ্টি আনে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু। তারপর বৃষ্টি আসে আরব মহাসাগরের পশ্চিম কূলে। মুম্বই-এর পথঘাট যখন জল থই থই, বিপুল বর্ষণে সার সার গাড়ি আটকে পড়ে আছে রাজপথে জমা জলে, তখন পশ্চিম মহারাষ্ট্রেও আরম্ভ হয়েছে প্রাক্ মনসুন বৃষ্টিপাত, আকাশে মেঘ, বর্ষা নামছে পুনে সাতারা কোল্হাপুর জেলায়, সহ্যাদ্রি পর্বতমালা ভিজে উঠেছে। মারাঠওয়াড়ায় পশ্চিমঘাট পর্বতমালা পেরিয়ে বাষ্পমেঘ পৌঁছয় না অত শিগগিরই, আবার দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুও বর্ষা নিয়ে আসে না।

রোদ মাথায় নিয়েই সাতারা থেকে বেরিয়েছিলেন দয়া যেশি, সঙ্গে দীপক, আর সঞ্জয় আত্রে। সঞ্জয় একসময় মরাঠি সংবাদপত্রে ছিল, এখন নিজের ইচ্ছেমতন সাংবাদিকতা করে, যাকে পোশাকি ভাষায় বলে ফ্রি লান্সিং।

এছাড়া তার আগ্রহ পথ নাটক ও অনুবাদ নাট্যায়নে। এই ব্যাপারে দীপকের সঙ্গে তার দারুণ মিল। তাঁদের গভীর বন্ধুত্বের কারণও বটে এই শখ।

দীপকের গাড়ি চালানোর হাত খুব তেজালো। দীর্ঘ যাত্রায় একটানা চালাতে তার কোনও ক্লান্তি নেই। কেবল একটাই মুশকিল, পথে সে খাওয়া-দাওয়া করবে নিজের ইচ্ছেমতন। সবাই যখন দুপুরের রুটি তরকারি নিয়ে বসেছে, তখন সে হয়তো মুখে দুটো পান ভরে বসে আছে। তাকে বেশি পীড়াপীড়ি করলে বলবে, আমি তো ড্রাইভার। আমি কি পেট ভরে খেতে পারি? চোখে ঘুম এসে যাবে যে! দু'বার বলতে গেলে বেঁকে বসবে দীপক। বলবে, ঠিক আছে, তাহলে তোমরা কেউ চালাও। আমি এখন ভাত খাব। এমনিতে বাড়িতে তো সে রুটিই খায় গমের কিংবা জোয়ার-বাজরার, পথে নামলে অচেনা হোটেলে গিয়ে ভাতের খোঁজ করবে—সে সব জায়গায় সাতপুরুষে কখনও ভাত খায়নি।

বহু বছরের পরিচয়ে দয়া দীপকের এই সব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য জানেন, কাজেই খাওয়া নিয়ে সমস্যা ঘনিয়ে উঠলে তিনি চুপ

Ph. : 03228 266319
দি জনপ্রিয় জুয়েলার্স
উৎসবের আনন্দে
Near Old Punjab Bank
Tamluk, East Medinipore

করেই থাকেন, আর নিজের কাজ কীভাবে সারবেন। মন দিয়ে তাই ভাবেন। দীপককে ঘাটানো সমীচীন নয় এই সব সময়।

দীপকের কপালের উপর রঙিন কাপড়ের ফেট্টি বাঁধা, বড় বড় চুল যেতে ভুরুর উপর এসে না পড়ে, চোখ ডাগর, গায়ের রং কোমল শ্যাম, মাথায় খুব লম্বা নয়, হয়তো দয়ার চেয়ে সামান্য বেশি হবে। স্বাস্থ্য কবছর আগেও বেশ ভারী ছিল, এখন কিছুটা লঘু হয়েছে। দয়ার সঙ্গে, সঞ্জয়ের সঙ্গে অনেক কাজে জড়িয়ে নিয়েছে নিজেকে, দীপক। পথে বেরলে স্নান-খাওয়ার সময় পাচ্ছে না প্রায়ই, তুলনায় সঞ্জয় ছ'ফুটের মতো লম্বা, কৃশ, আর মাথার চুল হালকা হয়ে এসেছে সামনে। বয়স চল্লিশের কাছে, কিন্তু দেখে মনে হয় আরও বেশি।

সঞ্জয় যখন সঙ্গে থাকে, দীপকের নানারকম ট্যানট্যাম দেখলে বলে, ঠিক আছে, দাঁড়াও না আমিই চালিয়ে নেব বাকি পথটা! কিন্তু সেটা আর হয়ে ওঠে না। পিছনের সিটে বসে সঞ্জয় গাড়ি নিয়ে এমন সব খুঁটিনাটি প্রশ্ন করে, যে দয়া মোটেই ওর ওপর ভরসা করতে পারেন না। যেমন 'ওয়াইপার'টা চালু হয় কীভাবে? সামনের ডানদিকের চাকাটা একটা শব্দ করছে না? পাংচার নয় তো? অথবা, জানলার কাচ ভাঙার জন্য কখনও হেড রেস্টের রড দুটো ব্যবহার করেছ, দীপক?

দীপকও মুচকি হেসে চালিয়ে যেতে থাকে। সে জানে, তাকে ড্রাইভারের সীট থেকে টেনানো অত সোজা নয়। এখানেও একটা সূক্ষ্ম রেখা টানা আছে।

দয়া যেটাই বলি ভীষণ বিরক্ত হন অথবা বাড়াবাড়ি রকমের রেগে যান, তবে স্টিয়ারিং-এ নিজেই বসবেন। দীপক সেটা জানে এবং মোটেই চায় না এমন কিছু হোক। দয়ার নানা কাজ। সারাদিন অজস্র ফোন, নানা প্ল্যানিং কুটিচিন্তা, অনেক রাত পর্যন্ত লেখালিখি থাকে, তার ওপর যদি সফরের সময় গাড়িও চালাতে হয়... না, না, হতেই পারে না। তবে দীপক আছে কী জন্য!

এই জন্য আড় চোখে দয়ার মুখ লক্ষ করতে থাকে দীপক। কোনও বড় গণ্ডগোলের সম্ভাবনা দেখলেই সতর্ক হয়ে যায়।

আজ সকালে বেশ তীব্র রোদই ছিল। সাতারা থেকে অহমদনগরের পথ ধরে মারাঠওয়াড়া বিড জেলায় পৌঁছন, 'শিরুর' নামের দুটো জনপথ আছে পথের দু'প্রান্তে। একটা অহমদনগরে। অন্যটা বিড জেলায়। সেই শিরুরের সঙ্গে কাসার কথাটা জুড়ে জায়গাটির নাম হয়েছে শিরুর 'কাসার'। কাসার সম্প্রদায় হয়তো কখনও এখানে বসত করেছিল বড় সংখ্যায়। এরা অর্ধ যাযাবর। গ্রামে গ্রামে ঘুরে বিয়ের অনুষ্ঠানের আগে মেয়েদের কাচের চুড়ি পরিয়ে আসে।

শিরুর কাসার একটি ছোট আধা শহর। তালুকা বা রাজস্ব তহশিলের মুখ্যালয় বলে কিছু সরকারি অফিস এখানে আছে। আছে কাচ চালানোর মতো দোকানপাট, সব্জি বাজার। বিড জেলার গ্রামগুলিতে নিজের কাজকর্ম দয়া যেশি এখান থেকেই চালান। সাতারা থেকে সাড়ে তিনশো কিলোমিটার এসে তখনই গ্রামে ঢুকে যাওয়া খুব সহজ নয়। বিশেষ করে, শহর ছাড়ানোর পর রাস্তাঘাটের অবস্থা ভালো নয়। গাড়ির স্পিড কমে আসে আপনা থেকেই। রাজনীতিকরা যত বেশি হেলিকপ্টারে চড়ে এ জেলা ও জেলা করেন, রাস্তাঘাটের রক্ষণাবেক্ষণ ততই করুণ হয়ে আসে। কারণ পূর্ত বিভাগ বা পঞ্চায়েত বিভাগের কারিগরি টিম একেবারেই হাল ছেড়ে দেয়। বাসে বা ট্রেকারে চড়া সাধারণ মানুষদের জন্য কার আর মাথা ব্যথা? দেশটা তো পলিটিক্যাল এলিটদেরই জন্য।

কিছুদিন লম্বা সময় ধরে যাতায়াত করার পর শিরুর কাসার বাজারের কাছে একটি বাড়ির দোতলা ভাড়া নিয়ে নিজের ক্যাম্প অফিস বানিয়েছেন দয়া। দোতলার বড় হলঘরে মেয়েদের গ্রুপ ট্রেনিং হয়—আবার রাতেরবেলা পাশাপাশি ক্যাম্পখাট ফেলে শোওয়া যায়। একতলার ডানদিকে মাঝারি হলঘরটি রান্নাঘর। বাসনকোসন মশলাপাতি গ্যাসের উনুন শুকনো খাবার সবই রাখা থাকে এখানে। সাতারা থেকে যখন আসেন, তখন দয়া সঙ্গে আনেন শাক-সব্জি, ফলমূল, আচার ইত্যাদি। যাতে এখানে পৌঁছেই বাজারে না ছুটতে হয়। দোতলায় আরও একটি বড় ঘর আছে। ট্রেনিংয়ের পোস্টার বইপত্র টেলিভিশন সেট সব সেখানে রাখা আছে সাজিয়ে। এখানেও আছে চার-পাঁচটি ক্যাম্পখাট। মানুষের সংখ্যাধিক্য হলে এই হলঘরেও কয়েকজন ঘুমোতে পারে।

তালুকা শহরটির কাছে দূরে যাটখানা গ্রামে অল্প বয়সি মেয়েদের এবং ঘরের বউদের দল গড়েছেন দয়া। প্রথমদিকে তাঁর কাজ ছিল বাল্যবিবাহ বন্ধ করা, মদের ঘাঁটি তুলে দেওয়া আর আইনি সাক্ষরতা ছড়িয়ে দেওয়া মেয়েদের মধ্যে। কিন্তু গত দেড় দশক তাঁকে পাল্টে দিয়েছে অনেকটাই। ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণ নিয়ে কেন্দ্রীয় আইন এসেছে, সংশোধন করে তাকে মজবুতও বানানো হয়েছে। মেয়েদের জন্য দয়ার কাজ দেখে রাজ্য সরকার রাজ্যস্তরীয় মনিটরিং কমিটিতে তাকে নিয়েছেন। এরই মধ্যে কয়েকবার এসে গেছে যশোবন্ত ধাবার মালিক। পুরুষ্ট গোঁফের ফাঁকে তির্যক হাসিতে বলে গেছে, কী ম্যাডাম কী দেখছেন? পেরেকের মাথায় হাতুড়ি মারুন, বাতাসে তরোয়াল চালিয়ে কী হবে?

এমন নয় যে দয়া জানতেন না সমস্যার স্বরূপ। এ অঞ্চলে তাঁর বহুদিনের যাতায়াত, বহু মানুষের সঙ্গে সখ্য। তবু চক্রব্যূহে ঢুকতে গেলে একটা কোনও সুড়ঙ্গ দরকার। পথের হদিশ চাই। ২০০১-এর জাতীয় জনগণনার জিলাওয়ার ফল হাতে এসেছে দু-তিন বছর পর। মারাঠওয়াড়ার জেলাভিত্তিক পরিসংখ্যান দেখাচ্ছে গত একশো বছরে মেয়েদের তুলনামূলক অনুপাত কমেই চলেছে এবং এখন সবচেয়ে কম এই জেলাগুলিতেই। সবচেয়ে অবস্থা খারাপ বিড জেলার। জন্মের সময়েই এক হাজার পুরুষ শিশুসন্তানের তুলনায় মেয়েদের সংখ্যা ৭৯৬।

প্রাকৃতিক নিয়মের হিসেবে জন্মের সময় ছেলে ও মেয়ের সংখ্যা একই হওয়ার কথা। জন্মের পর নানা ধরনের বঞ্চনার শিকার হয় কন্যাসন্তান, যথেষ্ট পুষ্টি পায় না, অসুখের ক্ষেত্রে তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা হয় দেরিতে, তার ফলে ছ'বছর বয়সে পৌঁছবার আগেই বহু কন্যাসন্তান অকালে ঝরে যায়। কিন্তু জন্মের সময় মেয়েদের সংখ্যা এত কম কেন? প্রতি এক হাজার ছেলের তুলনায় দুশো মেয়ে কম জন্মাচ্ছে। নিখোঁজ শিশুকন্যা এরা। কীভাবে নিখোঁজ হয়? জন্মের আগেই এদের নিকেশ করে কারা?

যশোবন্ত ঘুরিয়ে নিয়ে দেখায় দয়াকে। তার খাওয়ার হোটেলে নানা মানুষজন আসে, অন্য জেলা থেকে। তাদের লক্ষ করে যশোবন্ত। গতিবিধির খবর নেয় টাউনে নিজের চেনা মানুষজন মারফত। যত দিন যাচ্ছে, ততই বেড়ে উঠছে ঝক্‌ঝকে তকতকে ওয়েদারকোট রঙে রঙিন বড় বড় বাড়ি। শিরুর কাসারের মতন ছোট তালুকাকে বিড যাবার পথের ধারে প্রসূতিসদন, পলিক্লিনিক, মাতৃভবন, মাল্টি ক্লিনিক এমন সব বোর্ড আঁটা নতুন নতুন বাড়ি। দয়া বুঝতে পারছিলেন, নিঃশব্দে অথচ সমস্ত প্রশাসনের ঠিক নাকের ডগায় বিড পরিণত হচ্ছে এক বধ্যভূমিতে, সেখানে গর্ভস্থ ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণ এবং ভ্রূণ নিষ্কাশন এই যুগল পদ্ধতি সেরে ফেলার জন্য ছুরি শানিয়ে বসে আছেন প্রসূতি চিকিৎসা বিশেষজ্ঞরা। আমের গন্ধে যেমন বড় কালো মাছি উড়ে আসে, তেমন নতুন নতুন ডাক্তার এসে ক্লিনিক খুলছেন বিড জেলা সদরে। ট্রেকার জিপ, ভাড়া গাড়ি চেপে গাঁ-গঞ্জ থেকে, বাইরের জেলা, এমনকী পড়শি রাজ্য থেকে পোয়াতি বউদের তুলে নিয়ে চলে আসছে শ্বশুরবাড়ির লোকজন। আখ কাটাই মজুরদ যাঁরা দেশান্তরে যায়, বড় চাষি

মাঝারি চাষি যাদের কোঠাবাড়ি আছে, ব্যবসাদার ঠিকেদার— নানা ধরনের নানা রঙের লোকজন, কারও টাকা বেশি, কারও কম, কিন্তু পোয়াতি মেয়ে-বউ-এর ব্যাপারে তারা সব এক জোট। ছেলে বিয়োও, যত জলদি পার। যদি একবারে না পারো, ভ্রূণের লিঙ্গ পরীক্ষা করাও, মেয়ে হলে তাকে নিকেশ করো, তারপর গর্ভ ধরতে থাক, ধরতেই থাক, যতদিন না তুমি শশুরবাড়িতে দিতে পারছ একটি পুত্রসন্তান। ছেলেসন্তানের জন্য কেন এই আকুলতা, মেয়েদের ওপর কেন এত আক্রোশ? ছোট শহর গ্রামগঞ্জে ঘুরে দেখা জানতে চান মেয়েদের কাছেই। কী চাও, তোমরা কি এই চাও? নিজেদের পরের প্রজন্মকে নিকেশ করতে?

আমরা কী করব? কী বলব তাঁদে? আমাদের কথা কে শুনবে? ঘোমটার আড়ালে ঠোঁট নড়ে ওঠে, থিরথির করে কাঁপে চোখের পাতা। মারাঠওয়াড়ার মেয়ে, শক্ত-পোক্ত, জন্ম শ্রমিক তাঁরা। ছোটবেলা থেকেই ঘরদোর ঝাড়ামোছা, মোষের দুধ দোওয়া, কাপাস তুলো তোলা, কাঠ আনা, ছোট ভাই-বোনদের স্নান-খাওয়া করানো, টোলিতে গিয়ে আখ কাটাই—এমন কাজ নেই মেয়েরা পারে না। শরীরে তাদের মেদ নেই এক ছিটে, বাসি ভাকরি আচার দিয়ে খেয়েই এমন তাকত, দুধ, ফল, মিষ্টি গরম ভাত—এরা কখনও চোখে দেখেনি। এদের মায়েরাও নয়। এসব খাতে পুরুষদের জন্য, কর্তা ও তাদের পুত্রসন্তানদের জন্য।

হাঁড়ির তলা চেঁছে, ডেকচির ধার মুছে যেটুকু খেতে পায়, তাইতেই ফনফনিয়ে ওঠা আখের চারার মতো স্বাস্থ্য এই মেয়েদের। কিন্তু নিরাপত্তা কই? কেবল নিজেকে চেকে, আড়াল করে, পালিয়ে পালিয়ে বেড়ান, যেন বলির বধ্য পশু!

পুরুষের চোখ ভড় ভয়ানক এ দেশে। পথে বেরলে, খেতে কাজে নামলে, স্কুলের ব্যাগ নিয়ে কাঁচাপথ ধরলে, বয়স দশ হোক বা চল্লিশ, অঙ্গ চেটে নেবে তাদের লোলুপ দৃষ্টি। মেয়ে মানে তাদের কাছে ব্যবহার যোগ্য পণ্য, একটা শরীর এর বেশি বা কম কিছুই না। সঙ্গে পুরুষ থাকলে, বাপ ভাই মরদ যে-ই হোক, সে মেয়ের মালিক আছে। আর সব সময় তো সঙ্গে মালিক মরদ নিয়ে চলাফেরা করা যায় না, কাজেই দশ বছরের বালিকাও শিখে যেয় ওড়না দিয়ে কীভাবে ঢেকে নিতে হয় নিজের অনাগত যৌবন। বয়স্ক রমণীর শাড়িতে মাথার কলসির জল ছিটকে পড়লে জয়ী খেলতে বসা পুরুষ দলের লোলুপ দৃষ্টি তার শরীরে পড়বেই, রক্ষা নেই।

সেই জন্য জন্মদাতা বাপ মা-ই কুট-ঝামেলা চায় না। খতুমতী হল মানেই সে মেয়ের জন্য পাত্র খুঁজতে বেরবে। যুবক তরুণ হলে ভালো না হলে দোজবরে বিপত্নীক ঘরেই সই। মেয়েকে এমন একটা জায়গায় তুলে বসিয়ে দিয়ে আসা, যেখানে যা কিছু ঘটবে তার দায় আর বাপ মায়ের নয়, অন্য এক পরিবারের। যে মেয়েরা টোলিতে যায় পরিবারের সঙ্গে মেয়ে হিসেবে অথবা বউ হয়ে, তাদের বিপদ অন্য পুরুষমানুষের থেকে, যারা স্ত্রী পরিবার ছেড়ে এক গেছে, অথচ আট মাসের চিনা নারী সঙ্গের খরায় তাদের দৃষ্টি অন্য মেয়েদের ওপর পড়বে। তাছাড়া সবার মাথার উপর আছে ঠিকেদার আর তার 'কাছের' লোকেরা—টোলির দরজাবিহীন ঝুপড়িতে যাদের গতায়াত রোগার মতো কেউ নেই, পুরুষ যখন 'কাটাই'-এর কাজে খেতে নেমে গেছে ভোর রাত্তিরে। মেয়েদেরও যেতে হয়, তবু দু-একটা পোয়াতি, অথবা নতুন বউ রাতের বেলা টোলির ঝুপড়িতে খুঁজলে পাওয়া যায়। মরদই হয়তো তাদের ছেড়ে গেছে একটু বিশ্রাম পাবে বলে। অল্প বয়সি বউ মেয়েদের তবু টোলিতে সঙ্গে নিয়ে যাওয়াই শ্রেয় বলে মনে করে অধিকাংশ পরিবার, গ্রামে ফেলে রেখে যায় না। শুনশান গ্রাম, যেখানে চার ভাগের তিন ভাগ মানুষই ভিনদেশে গেছে মজদুরিতে, পড়ে আছে স্কুল-হস্টেলে থাকা ছোট ছেলে কিছু এবং বুড়ো-বুড়িরা—সেখানেই বা মেয়েদের নিরাপত্তা কই? দয়াকে এই নিরাপত্তার ধারণাটা খুব বিভত করত। মেয়েদের সঙ্গে যেমন কথা হতো, পুরুষ অভিভাবকদের সঙ্গেও। নিরাপত্তা মানে তাদের ভালো থাকা, ভালো, পুষ্টিকর খাবার খাওয়া, যত্নে থাকা—এসব কিছুই নয়। সোজা ভাষায় এর মানে পরিবারের ইজ্জত মানে মেয়েদের ইজ্জত। ইজ্জত মানে তাদের যৌন নিয়ন্ত্রণ। বিবাহিত পুরুষের দ্বারা। যদি এর অন্যথা হয়, যদি স্ত্রী বা মেয়ে অন্য পরিবারের পুরুষের দ্বারা আক্রান্ত হয়, স্পর্শিত হয়, তাকে কেউ তুলে নিয়ে যায় তবে তার নিরাপত্তা বিঘ্নিত হল। পরিবারের ইজ্জত থাকল না। যারা দেশান্তরে জন কাটতে যায়, আখ কাটাই-এর কাজে, তাদের ঘরে মেয়ে হলে বলে—'এক কইতা কমি' মানে একটা কাস্তে কম হল। স্বামী-স্ত্রী মিলে এক কাস্তে, ব্যাটাছেলে সন্তান—সেও আধ বা সিকি কাস্তে। কিন্তু মেয়ে তো বাপের সংসারে থাকবে না। সে চলে যাবে পরের ঘর, তাদের ঘরের যে কাজের হাত, তাতে জুড়ে যাবে, বাপের ঘরে কম হবে একটি হাত, একখানা কাস্তে। তবে বাপের লাভ কী? বিয়ে থা দিয়েও কি লাভ আছে? আগে তবু পুরনো গয়না, বাসন-কোসনের সঙ্গে শাড়ি-কাপড় আর বিয়ের খরচ দিলে মেয়ে পার করা যেত। যত দিন যাচ্ছে লোভ তত বেড়ে উঠছে মানুষের। ম্যাট্রিক ফেল, বেকার ছেলে চায় তিন-চার লাখ নগদ, মোটর সাইকেলের সবচেয়ে নতুন মডেল, তার সাত পুরুষ যেন উলঙ্গ হয়েছিল এতদিন, তেমন সংখ্যার শাড়ি-কাপড় চায় বাবা-মা, তাছাড়া গয়না, খাট-পালঙ্ক, ফ্রিজ, ওয়াশিং মেশিন, বাসনপত্র তো আছেই। তাও যদি বিয়ে দিয়ে দেনাপাওয়ার ব্যাপারটা চিরতরে বন্ধ করা যেত! এ তো আর ব্যবসার চুক্তি নয়, যে, দু'পক্ষের মধ্যে স্ট্যাম্প পেপারে লেখা হয়ে গেছে। যাদের লালচ্ বেশি সেইসব শশুরবাড়ি, তক্কেতকে থাকে—হয়তো তুলোর ফসল ভালো হল, নইলে আখ কাটার 'উচল' বা নগদের রেট বাড়ল কোনও বছর—তারাও চাপ বাড়াল—মেয়েকে যদি ভালো রাখতে চাও, তো দেখো—আরও কিছু দাও। মেয়ের শাশুড়ির হাতের বালা, নাকের নথ, নইলে ট্রাক্টর কেনার খরচের আধা—যা হাতে আসে।

যদি মেয়ের বাপ দিতে পারল তো ভালো, নইলে চলল মেয়ের ওপর গঞ্জনা, বাপের বাড়ির নিন্দেমন্দ, অনবরত চাপ, তারপর একদিন মেয়ের আধপোড়া শরীরটা শিকলবদ্ধ একটা ঘরে রেখে বাপের বাড়িকে খবর দেবে—এসো, দেখো, তোমাদের গুগের মেয়ে গায়ে আগুন দিয়ে মরেছে। অনেকে খবরও দেয় না, লাশ পুড়িয়ে তবেই ডাকে, ওতে পুলিসি ঝামেলা এড়ানো যায়। পুলিসও আবার নিজের পাওনা বুঝে নেবে, দু'পক্ষের কছ থেকে। যম ছাড়লেও পুলিস ছাড়ে না।

কাজেই মেয়েদের জন্ম না দেওয়াটাই বুদ্ধির কাজ। একবার জন্মালে তার বরাত মন্দ, ইজ্জত নিয়ে টানাটানি, বিয়ের পর লাঞ্ছনা গঞ্জনা। বাড়ির লোকেরও হয়রানি। মেয়ে জন্ম দেবার ঝামেলা পোয়ানোর চেয়ে জন্মের আগে তাকে নিকেশ করতে খরচ কম, হাতে দাগও লাগে না। মেশিন আছে, বড় ডাক্তারদের হাত আছে মাথার উপর। হাজার টাকায় মেয়ে না ছেলে তার জাঁচ, তিন হাজার টাকায় মেয়ে খালাস। কারখানায় যেমন কনভেয়ার বেল্টে পটাপট ব্যাগ সেলাই হয়। সেইরকম নিঃশব্দ, নিখুঁত প্রণালীতে চলে। চলতেই থাকে মারণযজ্ঞ। আইন এসেছে নাকি, তা আইনকে ঠেকিয়ে রাখবে বলে ডাক্তার, পুলিস, জেলার সিভিল সার্জন সব সাতগাঁট বেঁধে বসে আছে, না জন্মানো মেয়ের বাপ-মায়ের কীসের চিন্তা!

যতই দিন যায়, নগর সভ্যতা তার নানা ঐশ্বর্য ছলাকলা নিয়ে ডানা ছড়িয়ে বসে, মানুষের টাকার আমদানি বাড়ে, গ্রামগুলি তাদের যাবতীয় জঞ্জাল, আবর্জনা, খরা ও উচ্ছিন্ন জীবন প্রণালী নিয়ে সংযোগবিমুখ হতে থাকে, অজাত মেয়েদের ভবিষ্যৎ ডুবে

যেতে থাকে আরও, গাঢ় অন্ধকারে—কারণ বিবাহিত মেয়ের পরিবার চায় 'সুরক্ষিত' ভবিষ্যৎ, ঝুটঝামেলোহীন সংসার, ডাক্তারবাবুরা চান আরও পশার, নামডাক, কাঁচা টাকা।

শিক্ষর কাসারের মতো ছোট তালুকা শহরে গজিয়ে ওঠা এই যে দোতলা তিনতলা ক্লিনিকগুলো, ওগুলো আসলে খোল, খশোবস্ত দেখিয়েছিল। ওদের ভিতর কোনও মেশিন, যন্ত্রপাতি বা ডাক্তার নেই। আছে ছিমছাম গোছানো রিসেপশন কাউন্টার আর কম্পিউটার, স্মার্ট কেতাদুরস্ত সব ছেলে-মেয়ে যাদের নাম ডেটা এন্ট্রি অপারেটর। বাইরে থেকে পার্টি এখানে এসে পৌঁছলে, দালালরা উত্থিত হয়, তারা জেলার কন্যাভ্রূণ মারার কল খুলে বসেছেন যে সব ডাক্তার, তাদের সঙ্গে ফোনে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করিয়ে দেয়। নিখুঁত ব্যবস্থা। সব ভেবেচিন্তে শিক্ষর কাসার তালুকার সদরেই নিজের অফিসখানা ভাড়া নিয়েছেন দয়া যোশি। এখান থেকে ষাট-সত্তর খানা গ্রামে সুবিধে মতো পৌঁছনো যাবে, যেখানে তাঁর কাজ চলে স্কুলে, পঞ্চায়েতে, গ্রামের ভিতরে—বাল্যবিবাহ বন্ধ করার, মেয়েদের স্কুলে ফেরানোর, তাদের একজোট করার। পড়াশুনো শিখে স্বনির্ভর না হলে জীবন পূর্ণ হবে না; অল্প বয়সে অপুষ্ট সন্তানের জন্ম দিলে তার কী পরিণতি হবে, নাবালিকা অবস্থায় কারও স্ত্রী হলে তারই বা স্বাস্থ্যর গতি কী—এই সব কথা আলোচনা করতে হয় সাবধানে, গ্রামের পুরুষ বা প্রধানদের কান এড়িয়ে—কারণ দয়া মেয়েদের কুপরামর্শ দিচ্ছেন জানলে তাগুণ করতে তারা। এই সব কাজের সঙ্গে সঙ্গে খশোবস্ত-এর ধাবা আর হাসপাতালগুলিতে প্রসূতি ভর্তির খবর রাখাও সুবিধেজনক ভাড়া নেওয়া অফিসবাড়ি থেকে। সাতারা থেকে বার হয়ে মাসে দু'বার এখানেই পৌঁছে যান দয়া। সঙ্গে দীপক সব সময়ই থাকে। মাঝে মাঝে আরও কেউ। সাতারা জেলায় তাঁর নিকট বন্ধু ও সতীর্থদের কেউ কেউ দয়ার কাজে পরোক্ষভাবে জড়িয়ে গেছে। ডাক্তার কৌশল্যা আছেন, সিস্টার পাতিল, আরণ্যাও আসে মাঝে মধ্যে। সাংবাদিকদের মধ্যে বেশকিছু উচ্ছল্ল তরুণ, তরুণী, সঞ্জয়ের মতো মধ্যবয়সিও দয়ার নিত্য সাথী। এরা সঙ্গে আসে, অনুষ্ঠানে থাকে, ছবি তোলে, রিপোর্ট লেখে। বড় গাড়িটি মানুষ খাবার ও কাজের সরঞ্জামে টইটুম্বুর হয়েই চলে। সে সব লোড করার এবং বিভিন্ন জায়গায় নামানোর ঝক্কি দীপককে নিতে হয়। এবার সজ্জা এসেছে, তার ইচ্ছে গত দেড় দশক ধরে দয়ার নেতৃত্বে গড়ে তোলা মেয়েদের নিয়ে অভিযানের একটি ডকুমেন্টেশন করবে। ছবি তুলবে, ভায় লিখবে, দরকার হলে অংশ বিশেষের নাট্যরূপ দেবে। চলচ্চিত্রায়ণে টাকার দরকার হয়, সে কথা এখনই ভাবছে না সঞ্জয়। কিন্তু দীপক তার হাতে ধরা ক্যামেরায় ছবি তুলে রাখছে স্টিল-এর পাশাপাশি। একদিন কাজে লাগবেই। দয়ার কাজের প্রতিটি মুহূর্ত ক্যামেরা বন্দি করে রাখতে পারলে খুশি হয় দীপক। কিন্তু তা তো আর সত্যিই সম্ভব নয়।

ইচ্ছে ছিল জলখাবার খেয়েই বেরিয়ে পড়বেন, বিকেল বিকেল এসে পৌঁছবেন শিক্ষর কাসার। নিজের অফিসে কাজের জায়গায়। তা হল না নানা কারণে। পথে বেরবার সময় অমনই হয়। বাড়িতে নানা জেলার মানুষজন আসে, সাতারা জেলার তো বটেই, তাঁই একবার গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়লে তাঁকে বার পাঁচ ছ'দিন আর দেখতে পাওয়া যাবে না, এ কথা জানে মহল্লার কালো বেড়ালটাও। তিনি এমএলএ বা কাউন্সিলার নন, সরকারি অফিসারও নন, তবু লোকজন দরখাস্তের ওপর সই করাতে আসে। পুলিস এফআইআর নিচ্ছে না, ভাগিয়ে দিচ্ছে, বাড়ি থেকে যুবককে বিনা গ্রেফতারি পরোয়ানায় তুলে নিয়ে গেছে পুলিস—ফোন করতে হবে দয়া তাঁই। গলা তেমন গম্ভীর নয় দয়ার, তবে সভা সমিতি মিছিল করার ফলে কণ্ঠস্বরে একটা সজীব এবং গর্জমান ব্যাপার আছে—ফোন তুলে, 'মি অ্যাডভোকেট দয়া যোশি বোলতে' বললেই ও পাশে থানায়, এমনকী এসপি-রও কণ্ঠস্বর নরম হয়ে যায়। কেন?

পরবর্তী ধাপে দয়া যখন তেজের সঙ্গে হাসি মিশিয়ে বলেন, মি য়েউ কা তিথে? আমি যাব নাকি, আপনার ওখানে? অফিসার হাঁ হাঁ করে ওঠেন। দয়া খুবই বিপজ্জনক এক ব্যক্তি। অনেকটা আনচার্টাড মিসাইল-এর মতন, কখন কার ওপর পড়বেন কেউ জানে না। বিপদের প্রথম সংকেত তো তিনি মহিলা বলো। তার ওপর, আইনজীবী। তার সঙ্গে একা হাতে লড়ছেন জেলার ও বাইরের বহু মানুষের সঙ্গে। ডাক্তারদের লবি তাঁকে মনেপ্রাণে ঘৃণা করে কিন্তু কিছু করতে পারে না। কারণ দয়ার রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই, তিনি কোনও বিশেষ দলের এমপি বা এমএলএ, অথবা মন্ত্রীর আত্মীয়ও নন। এবং সবচেয়ে যেটা দুর্দান্ত; সেটা হল পনেরো মিনিটে পাঁচশোর ওপর মহিলাকে দিয়ে থানা ঘেরাও করিয়ে দিতে পারেন। করিয়েওছেন অতীতে। কাজেই দয়ার ফোনবাহিত অনুরোধে ওঁর বলা কাজটা করে দেওয়াই সমীচীন মনে করেন থানাপ্রভারী অথবা তহশিলদার। তাঁর বাড়ির দরজার কাছে যে মানুষটি এসে দাঁড়িয়েছে, তাকে তিনি প্রার্থী মনে করেন না। সেও তাঁর অধিকার রক্ষার লড়াইয়ের একজন সহযোদ্ধা। নাই বা থাকল তার ফিরতি পথের ভাড়া অথবা পাঁচে অট্টর চটি। কাউকে তিনি কথা বা অভিযোগ না শুনে ফেরান না এবং তারপর ফোন নিয়ে বসেন, এ-অফিস, ও-থানায় ফোন লাগান। খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করেন। প্রমীলা কাউকে চা রুটি, কাউকে চিঁড়ের পোহা, কাউকে দই সহযোগে ভাক্‌রি সরবরাহ করে। এসব কাজে সে কখনও বিরক্ত হয় না। তার সংসার দারিদ্র্যের কবল থেকে বেরিয়েছে, দুটি মেয়ে কলেজে পড়ছে, এ সবই সম্ভব হয়েছে দয়া তাঁই পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন বলে। এই করে বেলা যায়। তিনি বেরবার পর যে সব হতাশ পথিক এসে পৌঁছয়, অরণ্যা বা অভিজিৎ বাড়িতে থাকেন তাদের দায়িত্ব কাগজপত্র রেখে নেওয়ার। প্রমীলা অবশ্যই তাদের কিছু জলখাবার দেবে কর্ত্রী বলতে ভুলে গেলেও, বেলা বারোটা নাগাদ আজ যখন বেরিয়েছেন দয়া, মাথার উপর গনগনে রোদ। সাতারায় জলতল নীচে নয়, সেচের সুবিধে আছে, এই রোদ মারাঠওয়াড়ার আ-চষা মাঠে, জলহীন বিশাল ইঁদারাগুলির উপর ঝলকাচ্ছে ভাবলেই হৃদকম্প হয়। জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝি সময়, বর্ষা এখনও বহুদূর, তেষ্টার জল, স্নানের জল, রান্নার জল সবকিছুর টানাটানিতে মানুষ পশু অতিষ্ঠ, ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। এমনিতেই মারাঠওয়াড়ায় কলের জল সরবরাহ হয় মাসে দু'বার। পানের জন্য সেই জল ধরে রাখে গৃহস্থ। ট্যাঙ্কারের সাপ্লাই-এ রান্নার জলের কিছু সংকুলান হয়। বাকি রইল স্নান, জামা-কাপড় ধোওয়া। তার জন্য কুয়োগুলির সামনে শুকনো জলপাত্রগুলির নিশ্চল মিছিল দেখলে মনে হয় কলসি কুঁজো ক্যানেস্তার শরীর ধরে প্রেতেরা নরলোকে পিণ্ডের জন্য হাপিত্যেশ করে বসে আছে। দুধ-চিনি-শস্যের দেশের মেয়ে দয়ার আগে প্রথম প্রথম এ সব দেখলে গা ছমছম করত। এখন গা সওয়া হয়ে গেছে, তবু বুকের ভিতর যে বেদনা টনটন করে ওঠে, তার কোনও নাম নেই। মাঝপথে খাওয়া-দাওয়া নিয়ে দীপকের সঙ্গে যুক্তিতর্ক সঞ্জয়ের এই সবে কিছুটা সময় গেছে। সোজাসুজি শিক্ষর কাসার এলে হয়তো সন্ধ্যা নামার মুখে পৌঁছতেন, কিন্তু আন্বালিষা বলে যে গ্রাম, নকোশির বাপের বাড়ি, তাদের আশ্বাকমী যোগিনীর ফোন আসছিল বারবার। মেয়েরা অপেক্ষা করছে। ওদের সঙ্গে কথা বলবে, তারপর আমার বাড়িতে খাবে দুটি। খেতের জোয়ার চাঙ্গিতে পিষিয়ে রেখেছি। তোমরা ঘরে ঢুকলে তবে তাওয়া চড়াব উনুনে। খাওয়া-দাওয়াটা তাঁর কাজের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ নিশ্চয়ই নয়—কিন্তু এই সব মেয়েকে দুঃখ দিতে প্রাণ চায় না দয়ার। এত কষ্ট সয়ে, প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করে, সামান্য

কিছু আয় করে আশাকর্মী হিসেবে। অথচ দয়ার প্রতিটি মিটিং-এ নিজের স্কুটারের তেল পুড়িয়ে আসবেই যোগিনী। সতেজ মুখ, চোখ দুটি আগ্রহে অস্থির, ভালো কথা বলে, গান করে। সবচেয়ে জরুরি কথা, দয়াকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে শ্রদ্ধা করে।

যোগিনী, নকোশি, ইন্দুমতীর মতো মেয়েরাই তাঁর আন্দোলনের প্রাণ। এক-একটি আগুনের ফুলকি!

আশ্বা-লিম্বা। আম আর লেবু। একটাই গ্রাম আবার দুটো গ্রামও বটে। মাঝখানে বয়ে গেছে, ছোট এক নদী, তাকে বর্ষাকাল বাদ দিলে বাকি সময় নালাও বলা যায়। আশ্বা গ্রামের মুখেই দাঁড়িয়ে বর্ণাঢ্য বিশাল অট্টালিকা—শ্রীক্ষেত্র জ্ঞানেশ্বরী আশ্রম। বিশেষ বিশেষ পুণ্যতিথিতে এখানে লাখের ওপর টাকা খরচ করে পারায়ণ হয়—অথচ লিম্বা গ্রামের একমাত্র প্রাইমারি স্কুলটি যার জর্জর জীর্ণ কোঠাঘরে শিশুরা প্রাণ হাতে করে পড়তে বসে, সত্যিই একদিন ভেঙে পড়ল একদিকের দেওয়াল সহ—ভাগ্যিস তখন বর্ষার রাত এবং ছেলে-মেয়েরা কেউ ও দিকে ছিল না—স্কুলটি মেরামতের জন্য গ্রামের লোকেরা কেউ একটি পয়সাও ঠেকাতে রাজি হল না। কারণ অবশ্যই সেই চিরন্তন—দারিদ্র্য। নানা জায়গা থেকে অর্থ সংগ্রহ করে, ব্যক্তিগত অর্থও জুড়ে, স্কুলটি আবার তৈরি করিয়েছেন দয়া। প্রাঙ্গণে গাছ লাগানো আরম্ভ হয়েছে, নতুন ঝকঝকে রং। আজ সন্ধের মুখে সেই স্কুলটিও দেখার ছিল। কিন্তু হল না।

নালাটির উপর এক কাঠের পুল আছে। ঠিক তার মুখেই উল্টে পড়েছে এক পুরনো বাবলার গাছ। বৃষ্টি নেই, বাতাস হয়তো তীব্র হয়েছিল কখনও। এই সব গাছের কাণ্ডের ভিতরটা অনেক সময়েই দীর্ঘ দাবদাহে, জনহীনতায় শুকিয়ে, ফাঁপা হয়ে যায়। অনাবৃষ্টির দেশ বলে এখানে খেতের ধারে, আলের উপর বাবলার গাছই লাগানো হয় যথেষ্ট পরিমাণে। এ গাছ সহজে মরে না এবং আকালের দিনে পরমাণ খাদ্য হিসেবে কাজে লাগে। একটি প্রজাতি আছে—তাদের নামই হল এড়ু বাবুল। 'এড়ু' মানে মারাঠিতে 'উমাদ'। এই সব গাছ যত্রতত্র জন্মায়, যেন মাথাই খারাপ হয়েছে তাদের। তবে, যতই ঢেঁকসই হোক, গাছেরও তো আছে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, জরা। এই বৃদ্ধ বাবুলটিও আজ ঝাঁকড়া চূড়া মাথা মাটিতে ঠেকিয়ে পড়ে গেছে দুপুরের মুখে। সেই তখন থেকেই যোগিনী ব্যাকুল হয়ে চেষ্টা করে চলেছে একে ওকে তাকে ধরে, গাছটা সরিয়ে পথটা কীভাবে মুক্ত করা যায়। গ্রামের পুরুষমানুষ যাঁরা সবে টোলি থেকে ফিরে মশুপে জুয়া আর তামাকের আড্ডায় বসেছে, তারা মোটেই চিন্তিত নয়। চার মাস মাত্র গ্রামে থাকবে, শীতের মুখে আবার শুরু হবে দাদন। এর মাঝে গাছ পড়ল কি সাঁকো ভাঙল তাতে তাদের কী আসে যায়? বৃষ্টিহীন এই সব ভিটে মাটি, খেত, সত্যিই কি তাদের? বিকেলের দিকে আর থাকতে না পেরে যোগিনী দয়াকে ফোন করেছিল। মেয়েরা অপেক্ষা করে আছে, অথচ গ্রামে আসার পথ নেই। পুলের পাশ দিয়ে নদীর উপর দিকে একটা পায়ে চলা রাস্তা আছে, তাঁকে, তুমি কি মোটর সাইকেলে চড়ে ওখান দিয়ে চলে আসবে? স্কুলটা কী নতুন, সুন্দর হয়ে উঠেছে, তোমাকে দেখাতাম!

যেতে পারলে ভালো লাগত কি? আজ কেন দয়াকে জড়িয়ে ধরছে ক্লান্তি! নাকি তিনি অনেক বেশি আশা করছেন গ্রামের জন সমূহদের কাছ থেকে। সকাল থেকে একটা বাবলার গাছ কেউ সরাতে পারেনি। কোনও চার চাকার গাড়ি যেতে পারছে না—সেখানে গিয়ে আমি কী করব? কার জন্য যাব? প্রতিটি যাত্রায় আজকাল জমে উঠছে সেই একই ক্লেদ ও ক্লান্তি।

গাড়ি আশ্বা গ্রামের জ্ঞানেশ্বরী আশ্রমের কাছে থাকল। সন্ধের এই অন্ধকারে মোটর সাইকেলের পিলিয়নে বসে গ্রামে যেতে ইচ্ছে করল না দয়ার। দীপক আর সঞ্জয় চলে গেল। স্কুলের ফোটো তুলে আনবে। আর যোগিনীর বানানো গরম গরম জোয়ারের রুটি। খাবারের নামে দীপকের স্নায়ুতন্ত্র যেন টান টান হয়ে উঠেছে। বেচারা দিনমানে ভাত পায়নি। কেবল চা আর পানের ওপর ভর দিয়ে এতটা পথ গাড়ি চালিয়ে এসেছে।

ওরা ফিরেও এল। আবঘণ্টা কেটে গেছে। গাড়ির দরজা খুলে দয়া আপন মনে ডায়েরিতে নোট করছিলেন। যোগিনীও এসেছে। অন্য এক মোটর সাইকেলে। পূর্ব পঞ্চায়েত প্রধানের সঙ্গে। মাথায় টাক। নিরীহ লোকটি। তার কথায় যে মাটিতে পড়া গাছ উঠবে না, তা স্পষ্ট, বেচারা নির্বাচনে হেরে বসে আছে। গাড়িতে বসে খাওয়ার মানে হয় না। হাত-পা ধোওয়া হয়নি, কাপড়-জামা বদলাতে হবে। পৌঁচলা নিয়ে ঈষৎ হতাশ দীপককে ক্ষুধার্ত রেখেই গাড়ি চলল শিরুর কাসার। অফিস-বাসার দিকে।

॥ ছয় ॥

ক্লান্তি আমার

অফিস বাড়িতে আলো নেই তা কাছাকাছি আসতেই বোঝা গেল। আলোহীন ছিল শহরের পথঘাটও। বেশি রাতে দোকানপাট বন্ধ হয়ে গেলে অমন অন্ধকার-ঝুপসিই দেখায়। অবশ্য শিরুর কাসারকে শহর বলাটা মূর্খামি। দু'সারি দোকানঘর আর ছড়ানো-ছিটানো কিছু পাকা বাড়ি, এই দিয়ে কি শহর হয়? মিউনিসিপ্যালিটিও নয় জায়গাটা। বরং বিডের ডাক্তারদের টাইম পাওয়ার জন্য তৈরি দালালদের ক্লিনিকগুলো, যেটা চৌমাথার আগে একটা গলির মধ্যে দাঁড়িয়ে, সেগুলো কিছুটা নাগরিক চরিত্র দিয়েছে শিরুর কাসারকে।

অফিসবাড়ির একটা ধারে মোটর পার্টস-এর দোকান। তার শাটার পড়ে গেছে। সেধারে কয়েকটা গাড়ি রাতের মতো পার্ক করা আছে। সত্যিই আলো নেই! দুর্বিষহ, না জ্বড়ানো উত্তাপের মধ্যে দাঁড়িয়ে আলো না থাকটা ততটা ভয়াবহ মনে হয় না দয়ার কাছে, যতটা ভীতিজনক মনে হয় জলের অভাব। এ অঞ্চলে বিদ্যুৎ বিতরণের সরকারি সংস্থা ঝাঁপ বন্ধ করেই বসে থাকে সংবৎসর। কারণ বিজলি যে পয়সা দিয়ে কিনতে হয় এ এলাকা তা বিশ্বাস করে না।

টাউনের ভিতর এবং গ্রামাঞ্চলেও যা অবাধে চলে, তা হল হুকিং বর্ষা নেই। চাষ নামমাত্র। চাষের খরচ পোষায় না, বিজলির বিল দেব কী করে? দিতে গেলেই তো আগে যুগ যুগ সঞ্চিত এরিয়ার বা বকেয়া শোধ করতে হবে। বাড়ির কানেকশনের বেশিটাই তাই। কে জানে আগের বাসিন্দা কী জট পাকিয়ে রেখে গেছে, কত টাকা বাকি ফেলে গেছে। বিদ্যুতের নথিভুক্ত খরিদ্দার মাত্র পাঁচশোগের একভাগ, আশি শতাংশ বিজলি নেয় হুকিং করে। যারা নথিভুক্ত খদ্দের, তাদের পাঁচ পার্সেন্ট বিল পেমেন্ট করে। কাজেই বিদ্যুতের বিতরণে সরকারি কোম্পানিরও অগ্রহণ নামমাত্র। সবচেয়ে বিপজ্জনক সময় হচ্ছে বর্ষার আগের দুটো মাস। এ সময় মাঝেমধ্যে বিদ্যুৎ চমকায়, বাতাস বয়— তা হলেই ব্যাঙের হাঁচির মতো তুচ্ছ কারণে বিদ্যুৎ সাসপেন্ড করে দেওয়া হয়, যাতে ব্রিডের কোনও ক্ষতি না হয়। সেই যে যায় বিদ্যুৎ, তা আর সহজে ফেরে না— কারণ যারা ফেরাবে, তারা তো আর আইন মানা উপভোক্তা নয়! গৈরকানুনী 'হুকিং'-এর কারিগর সব।

পথে আসতে আসতে নানা আলোচনা আর বিদ্যুৎও ছিল তার সঙ্গে, তখনই লাইন গেছে।

অন্ধকারে দোকানের সামনে বেঞ্চি পেতে যারা বসে আছে তাদের মুখে সংসারত্যাগীর ভাবলেশহীনতা। কী হবে? বিজলি এলে আসবে, না এলে আসবে না। স্নান, খাওয়া-দাওয়া, পানের জল?

বোতলের পানি আছে। স্নান, খাওয়া আলো এলে হবে। কেউ তো মরে যাচ্ছি না!

রাগ হয়, ক্ষোভ হয় এদের কথা শুনলে। মারাঠওয়াড়া, তার উচ্চবিত্ত শহরাঞ্চলগুলিকে বাদ দিলে, এমনই। নৈরাজ্যশাসিত। নির্বাপিত। জল নেই পানের, স্নানের, সেচের তাই। জলহীনতার রাক্ষসের মুখোশ পরে মানুষেরা বসে আছে।

কল শুকিয়ে খাঁ খাঁ করছে। খুলতেই তার ভিতর থেকে খড় খড় শব্দ বেরিয়ে এল। ক্যাম্পখাটে পা ঝুলিয়ে দিয়া বসে আছেন, দেখে অন্ধকারেই কাজে লেগে গেল দীপক। তাঁই-এর জন্য অন্তত হাতপা ধোয়ার জল চাই। গাড়িতে জলের বোতল আছে, তাই দিয়ে মুখ ধোওয়া যাবে না হয়।

বিশাল প্লাস্টিকের ড্রামে জল ভরে রাখে হুসেন। দিন কুড়ি আগে ভরা হয়েছিল। সেই জল, ড্রামের কোমরের নীচে পড়ে আছে। তাই সই। তেষ্টার জল পায় না বলে মানুষ। অন্ধকার ঘরে মোবাইলের আলো স্থির হয়ে আছে এক কোনায়। এখন আর নীচে রান্নাঘরে যাওয়ার মানে হয় না। রান্না বা চা করা কিছুই সম্ভব নয়। পানের জল যৎসামান্য আছে, গাড়ির ভিতর থেকে বোতলগুলি নিয়ে এসেছে সঞ্জয় আর দীপক। এখন ওরা কাগজের রেকাবে আম্বালিঙ্গা গ্রামের যোগিনীর হাতে বানানো জোয়ারের রুটি, ঝাল ঝাল পুর দেওয়া বড় লঙ্কার আচার খাবে। কৌটোয় দই আনা হয়েছিল, সারা পথ গাড়ির ঝাঁকুনি। সে দই নিশ্চয়ই ভীষণ টকে গেছে এতক্ষণে। জামাকাপড় বদলাতে গেলে আরও দেরি, তাই দয়া বসেই গেলেন ওদের সঙ্গে। খেতে হবে। কিছুক্ষণ পর বাতাস উঠল আবার, কড় কড় মেঘের ডাক শোনা গেল, বারান্দার গা ঘেঁষা নিম ও আমের দুটি কিশোর গাছ মাথা দোলাতে লাগল এবং মাটির গন্ধকে কালো পৃথিবীর বুকের পাঁজর খুলে বার করে আনল হাওয়া। বৃষ্টি এল। মৌসুমি নয় এ, তার তো অনেক দেরি, প্রথম প্রাক-মনসুন বৃষ্টি এল মারাঠওয়াড়ায়। কয়েক পশলা, কয়েক মিনিট, হাসিঠাট্টা, গান শোনায় মেতে গিয়েছিলেন তিনজনই। আম্বালিঙ্গায় পৌঁছনোর আগে, অহমদনগরে দীপকের ভাতের হোটেল খোঁজার পরের পর্বে, অনেকটা পথ ছিল। রোদে পোড়া, রুক্ষ কালচে পাহাড়ের সপাট রিক্ততা দিয়ে সাজানো উষর ভূমি। দীর্ঘ পথ। তখন হুসেনকে একটা ফোন করে দিলে হতো। হুসেন মোটর পার্টসের দোকানের ছেলে। ওর কাছে একটা চাবি থাকে। সতেজ, উৎসাহী, হাসিখুশি এক যুবক। তাকে বলে দিলে, সে পাম্প চালিয়ে উপরের ট্যাঙ্ক ভরে রাখতে পারত দুপুরে। দুপুরে নিশ্চয়ই বিদ্যুৎ ছিল। জল যদি ভরা না থাকে, তবে সমূহ বিপদ, কারণ বিজলি কখন ফিরবে তার ভরসা কেউ দিতে পারে না।

বাড়ির সামনের বড় রাস্তা পেরলে বেশ কিছু দোকান আছে। আইসক্রিম, মাছ-মাংসের ফ্রিজার। আজকাল এ সবের সর্বত্র দাবি। হোটেল আছে একখানা। এরা সবাই নিশ্চিন্তে বসে আছে। জিনিসপত্র গলে পচে যাক, বিজলি কোম্পানিকে ফোন এরা করবে না। করলেই ওরা এসে বকেয়া বিলের জন্য চেপে ধরবে, এটাই ভয়। দীপক গিয়ে খবর নিয়ে এল। পায়ে হেঁটেই, দুপুরের দিকেই বাতাস উঠেছিল, এত অল্প যে মাটি শুষে নিল তাকে, চোখের পলক না পড়তে। কিন্তু তাপ জ্বড়াল না তাত, দাহ কমল না বাতাসের, মাঝখানে বিদ্যুতের ফিরে আসা আরও অসম্ভব হয়ে গেল, আরও দুরবর্তী হয়ে গেল জলের প্রত্যাশা। আবার সেই হাঁফ-ধরা গরম ঘিরে নিল ওদের। জানলা বন্ধ করতে হল। কারণ এবার মশা, পোকামাকড় ঢুকে আসবে ঘরে। অথচ অন্ধকারের মধ্যেই সিঁড়িতে নিঃশব্দ পা ফেলে ঘরে ঢুকে এল দুটি ছায়া ছায়া মানুষ।

ইন্দুমতী এল। সাঙ্গেবাড়ি গ্রাম এখান থেকে আট কিলোমিটার। ওর বর সাহু কাজ করে টাউনে। তার মোটর সাইকেলে চেপে এসেছে। সাহু ঘন-শ্যাম, তাল ঢ্যাঙা, মুখচোরা মানুষ। স্বভাবে দর্শনে বউ-এর ঠিক উল্টো। সুন্দরী ইন্দুমতী চুলে ভুই-এর মালা পরে রঙিন শাড়িতে সেজে এসেছে। সাহু এসে অন্ধকারের মধ্যেই বড় হলের ধারে পাতা এক বেঞ্চিতে এসে বসল। ওকে দেখেই নাচের ভঙ্গিতে ছুটে গেল দীপক। ভালো মানুষ সাহুকে খ্যাপাতে ওর জুড়ি নেই। ইন্দুমতী তা আছেই দয়া যোশির কাজে, মেয়েদের দলে, দীপকের নাটকের গ্রুপে। সাহুর এসব কোনও গুণ নেই, টাউনের এক ওষুধের দোকানে সে সেলসম্যান। দয়া অফিস বাড়িতে এলে ইন্দুমতী আসবেই ছুটে। বর যেখানেই থাক, তাকে বলবে মোটর সাইকেলে চাপিয়ে নিয়ে আসতে অফিস বাড়িতে, দয়ার কাছে; তারপর ঝটপট হাত লাগাবে রাতের রান্নাবান্নায়। ভাংরি গড়ায়, গরম তাওয়ার উপর। সবজি কুটে দেবে, জল ভরে দেবে। রাতে শুয়ে পড়বে দয়া তাঁই-এর পাশের তোশকে। বর চলে যাবে, কিন্তু ইন্দুমতী থাকবে। পরদিন সকালে বেরিয়ে দয়া যোশি যে সব গ্রামে যাবেন, সেখানে তাঁর সঙ্গে যাবে ইন্দু।

নকেশি অর্থাৎ মিনু এটাকে আল্লাদিপনা মনে করে। সে জানে না, ইন্দুমতীর আসার পিছনে আরও কারণ আছে। তাঁই-এর কাছে সাতারার বাড়িতে গেলেও, যশোবন্ত এ অফিসে কখনও আসে না। সে চায় না, স্থানীয় লোকজন তার আসা-যাওয়া দেখুক। সাবধানী যশোবন্ত। ইন্দুমতী আর তার স্বামী সাহু দু'জনেই যশোবন্তের এজেন্ট। এদের কাছেই সাম্প্রতিক খবরাখবর রেখে দেয় যশোবন্ত।

"ওগো! জামাইবাবু গো... রাগ কোরো না, মান
কোরো না তুমি
মেয়ে আমাদের থাকবে হেথায়, একটি দুটি দিন—
যাবে যদি ফিরে যেও, কিন্তু ওকে থাকতে দাও,
ও জামাইবাবু, আপ মাৎ ঘবরাও—"

মুখে মুখে বানানো আজগুবি গান, কোনও এক চালু মারাঠি গানের সুর বসানো।

এই প্রচণ্ড দমঠাসা গরমে, অন্ধকারে, জলহীন কলের শাঁ শাঁ শব্দের ভিতর নেচে নেচে গান— দীপকের পক্ষেই সম্ভব।

সাহু চলে গেছে। দয়াকে যা কিছু খবর যশোবন্তের তরফ

REGENT EDUCATION & RESEARCH FOUNDATION
(Approved by AICTE & Affiliated to WBUT & WBSCTE)
ISO 9001:2008 Certified Institutes
:- Courses Offered :-
B.Tech (CE, EE, CSE, ECE,EEE)
Polytechnic Diploma (CIVIL, ME, EE, ETCE, ARCHITECTURE, CST)
B.Sc in Computer Science, B.B.A, MBA , MCA

Corporate Tie-up with-
NATIONAL & MULTINATIONAL COMPANIES
BARA KANTHALIA, BARRACKPORE : SEWLITELINI PARA, KOL-21 DIST- NORTH 24 PARGANAS.
Tel: 9831082008, 9836816130, 9007057333

থেকে দেওয়ার ছিল দিয়ে মোটর বাইকের শব্দও মিলিয়ে গেছে অন্ধকারে।

জানলাগুলো জম্পেশ করে বন্ধ করে দিয়েছে ইন্দুমতী। ফলে ঘর আরও গরম হয়ে উঠেছে। বিদ্যুৎ নেই। পাখা, আলো কিছুই না। ছেলেরা ওই দিকের হলঘরে, কোনও মতে রাতের পোশাক পরে শুয়েছেন দয়া। ঘুমোনো সম্ভব নয় এই অবস্থায়। ঘুম যদি আপনা থেকেই ক্লান্ত শরীর জড়িয়ে ধরে তবেই যা হয় হবে।

কাছে, পাশের তোশকে শুয়ে ইন্দু গুন গুন করছে— বড্ড গরম, না তাঁঈ? কী করব, বলো, যদি রাতে জানলা দিয়ে বিদ্যুৎ ঢুকে পড়ে ঘরে— আমরা পুড়ে মরে যাব! আর যদি নিশগাছে চড়ে বসে চোর, বারান্দটা পেরলেই তো আমাদের দরজা—

ধ্যাত, চোরের তো আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই...

না, না, তাঁঈ... আজ তো নয় ক'ফোঁটা বৃষ্টি পড়ল— টানা খরা চলছে, খাবে কী? চাষিবাসি লোক চোর হয়ে যাচ্ছে। এই তো গত বছর, খোলা আঙনে শুয়ে আছি শাশুড়ির পাশে... গুমোট থমথমে রাত, হঠাৎ দেখি একটা লোক আমাদের খাটিয়ায় বসেছে, ওমা... ভয়ে তো আমার হাত পা ঠান্ডা, যেন মরা আমি একটা... লোকটা বুড়ির নথ খুলে নিচ্ছে প্যাঁচ খুলে গো, আমি দেখছি, তাকিয়ে আছি, কিন্তু কিছু করতে পারছি না... বুড়ি বোধহয় জোরে আছে কিন্তু ভয়ে টুঁ শব্দ করছে না...

গরমে দম বন্ধ হয়ে আসছে। ঘুম আসবে না। অথচ ইন্দু ঘুমিয়ে পড়েছে। চিৎ হয়ে শুয়েছে। ওর নাক ডাকার ঘুর্..র্... ঘুম শব্দ আসছে একটানা। সরাদিন কাজ করে মেয়েটা। ঘুম ভেঙে ওঠার পর রাতের বিছানাতেই একমাত্র ওর বিশ্রাম। তার ওপর তিন সন্তানের মা। এছাড়াও যদি অ্যাবরশন করিয়ে থাকে তাও দুটো-তিনটে হবে। বারান্দায় এসে নিম ও আমগাছটির কাছে দাঁড়ালেন দয়া। এখানেও গরম, তবু নিঃশ্বাস নেওয়া যায়। ভিজে মাটির গন্ধ, গাছের পত্রাবলি কোমল? মাটির সংবাদ আনে তারাও। আজকের দিনটা কী অদ্ভুত! এতদিন পর হঠাৎই চলার ক্লান্তি জড়িয়ে ধরছে দয়াকে, মনে হচ্ছে পথ যেন আর ফুরবে না। এত গ্রামে গ্রামে ঘোরা, মেয়েদের গ্রুপ, তাদের জন্য ফিল্ম, নাটক, গান, খরা-পীড়িত অঞ্চলের মেয়েদের নিজের জেলায় নিয়ে এসে তালিম দেওয়া, হাসপাতালে স্টিং অপারেশন, সবই যেন ফুটো পাত্রে জল ঢালার মতন। ব্যালিবাবাই বহু করেছেন ঝাঁপিয়ে গিয়ে, কিন্তু মন বদলাতে পেরেছেন গ্রামের পুরুষদের? নিদেন মেয়ের মা-বাবার? অবলীলায় কন্যা-জন খসিয়ে যাচ্ছে যারা সেই ডাক্তারেরা আইনের ফাঁক গলে বেরিয়ে যাচ্ছে, জেলা সিভিল সার্জন থেকে আরম্ভ করে পুলিস, পাবলিক প্রসিকিউটর সব যেন মুখোশ এঁটে বসে আছেন— কাজের কোনও পরিণতি হয় না এত সহজে, দুনিয়া বদলায় না, অথচ কী বিপুল ঝুঁকি নিয়ে চলেছেন দয়া! কোটি টাকার ব্যবসা এই কন্যা-জণ হননের যজ্ঞে, ডাক্তারেরা সব স্থানীয়, বালবিবাহে জড়িয়ে আছেন স্থানীয় নেতা, বড় বড় পার্টি, জনপ্রতিনিধিরাও। আজকাল সুপারি দেওয়াটা কোনও ব্যাপারই নয়— দশ থেকে পনেরো হাজার টাকা আর মদ পেলেও খুনের সুপারি নিয়ে নেয় অপরাধীরা। কারণ খুনের কেস-এর চার্জশিট হতে হতে বুড়ো হয়ে মরে যাবে তারা।

হ্যাঁ, আজ প্রথম ভয় পেয়েছিলেন দয়া। সত্যিকারের ভয়! যখন গাছ পড়ে পথ আটকেছিল আম্বালিম্বা গ্রামের, দীপক সঞ্জয় দু'জনেই সন্ধের অন্ধকারে মোটরবাইক চড়ে গ্রামের দিকে গেল, দীপক তো নিশ্চয়ই ক্ষুধার্ত ছিল। অন্ধকার, ধারেকাছে কেউ নেই, মোবাইলের আলো জ্বেলে গাড়ির একটা দরজা একধারে খুলে বসে লিখছেন দয়া, নিজের ডায়েরিতে, হঠাৎ বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল, মনে হল ওদিকের জানলায় কেউ কি দাঁড়িয়ে আছে? রোমাঞ্চ হল সারা শরীরে, কলমধরা হাতটা কেঁপে উঠল। যদি এখানে গাড়ির মধ্যে কেউ তাঁকে হত্যা করে রেখে যেতে চায় কোনওভাবেই তা আটকানো যাবে না। সঞ্জয়, দীপক ফিরে এসে দেখবে, চাপ চাপ রক্ত সিটের উপর, অন্ধকারে, মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে আছেন দয়া...

দাভোলকরকে আততায়ীরা আচম্বিতে হত্যা করে গেছে। পানসারেকে ও গৌরী লঙ্কেশ নিজের বাড়ির চৌকাঠে দাঁড়িয়ে নিহত হয়েছেন। সাতারায় প্রতিবেশী পল্লিতে দাভোলকরের বাড়ি। দু'জনে সহযোদ্ধা ছিলেন একদিন 'কুসংস্কার' নির্মূল করার অভিযানে, সেই কাজে ট্রাস্টও গড়া হয়েছিল। যেমন বন্ধুত্ব ছিল, মনোমালিন্যও হয়েছে দয়ার সঙ্গে। নরেন্দ্র দাভোলকরের নির্জন বাড়িটি আজও দরজা এঁটে দাঁড়িয়ে আছে! পুনের ব্যস্ত জনপথে তাঁকে হত্যা করেছিল যারা, আজ তিন বছর পরেও তাদের খুঁজে পাওয়া যায়নি। আততায়ীরা গুলিতে রক্তাক্ত তাঁর শরীর পড়ে আছে গাড়ির ভিতর, আর তিনি দেহ থেকে ঈষৎ বিযুক্ত হয়ে বাতাসে ভেসে হত্যাস্থল দেখছেন, মনের অভিনিবেশের এইরকম একটা অবস্থায় হাঁকে দীপক ডেকে উঠল— তাঁঈ! দীপক এতদিন পরেও তাঁকে মা ডাকে না, তাঁঈ বলেই সে তুষ্ট। নড়েচড়ে বসলেন দয়া। তারপর তো অন্ধকারে ফেরার পর্ব।

ভাত না পাওয়ার জন্যই হোক বা অন্য যে কারণেই, দীপক আজ দুপুরেও খুব অন্যমনস্ক ছিল। সাতারা থেকে শিরুর কাসার পৌঁছবার দীর্ঘ পথে একমাত্র মরদ্যান অহমদনগর। সেখানকার ফুড কোর্টে শেষতম মহিলা শৌচাগার। তারপর পথই ভরসা। অহমদনগর জেলার সর্বত্র পশ্চিমঘাট পাহাড়ের ঢেউ— ঢেউ না বলে চূচাঁর বলাই ভালো, বৃক্ষহীন সপাট পর্বত প্রাচীর। কোথাও উঁচু জমি, কোথাও গাছপালা, গাছ মানে সর্বত্রই বাবুলের দল। হলুদ রোদ, হাহা করে হাসছে, দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত কেবল উষর শূন্যতা। ফাঁকা মালভূমিতে বাতাসকল বসেছে সারি সারি— যেন তৃষ্ণার্ত মানবকঙ্কাল যন্ত্র হয়ে গেছে। পশ্চিমঘাট পর্বতমালার বৈশিষ্ট্যই অবশ্য এই— যে পঁচিশ-ত্রিশ মাইল পর্যন্ত এক-একটি পর্বতশ্রেণীর বিস্তার। তারপর কিছু বিরতি দিয়ে আবার

SWAMI VIVEKANANDA GROUP OF INSTITUTIONS
(Approved by AICTE & Affiliated to WBUT & WBSCTE) ISO 9001:2008 Certified Institutes
- Courses Offered :-
BBA (H), BCA (H), B.Sc. Biotechnology (H), B.Sc. Microbiology (H) MBA, MCA, M.Sc in Bio-Technology, M.Sc. in Media Science, Applied Mathematics & Computer Science, BTTM in Travel & Tourism Management.
-: Our Colleges :-
SWAMI VIVEKANANDA INSTITUTE OF SCIENCE & TECHNOLOGY
SWAMI VIVEKANANDA INSTITUTE OF MANAGEMENT & COMPUTER SCIENCE
SWAMI VIVEKANANDA INSTITUTE OF MODERN SCIENCE
SHREE RAMKRISHNA INSTITUTE OF SCIENCE & TECHNOLOGY

Corporate Tie-up with-
NATIONAL & MULTINATIONAL COMPANIES
KARALA MORE, SONARPUR STATION ROAD, KOLKATA- 700103
PH-9831012072, 9831084446, 9831004445; E-MAIL: admin@svist.org; WEBSITE: www.svist.org

একটি পর্বতশ্রেণী। পাহাড়ের মাথায় পাথরের ছোট মন্দির। বাঁশে বাঁধা নানা রঙের ধজা উড়ছে। মাটির রং ঘোর কৃষ্ণ। এ মাটি ভাতি উর্বর। জোয়ার বাজরার জন্য। তুলা চাষের জন্য। উর্বর মাটি, অথচ কেবল বৃষ্টিনির্ভর জন্য ফসল ফলাতে পারে না। এ মাটি ফেলে চাষি গৃহস্থকে উপার্জনের জন্য দেশান্তরী হতে হয়। খেতের ধারে ধারে হলদেটে পিঙ্গল জোয়ার ও বাজরার খড়ের গাদা জড়ো করা। গত বছরের টিপিতে বর্ষার জল পড়ে কালো হয়ে গেছে। বিশ্রী দেখায়। ছাগল সেই ডিবির মধ্যে পুরো শরীর ঢুকিয়ে পোষান খাচ্ছে।

অসমের পথ ভুল করে, না ইচ্ছে করেই পথের ধারে উষর প্রান্তরে গাড়ি নিয়ে গেল দীপক। উষর কালো মাটি, দিগন্তলিপ্ত পাহাড়। বড় বড় পাথরের চাঁই, যেন মৃত মহিষের মুণ্ড। ওর মধ্যে দলে দলে ঘুরে বেড়াচ্ছে চিতল হরিণেরা। তারাও কি তৃষ্ণার্ত, জল খুঁজছে? কয়েকটি কৃষ্ণসার হরিণ ঢুকে পড়েছে ওই দলে। দেখো, দেখো, দেখো— দীপক বলছে! পথরেখা নেই, জিপটা যেন আপন মনে ঘুরছে। রোদে চোখে ধাঁধা লেগে যাচ্ছে দয়ার। একদিকে দগড় বাড়ি গ্রাম, অন্যদিকে বনজর বাড়ি। দগড় মানে পাথর। বনজর মানে উষর। কী হল দীপক, গাড়ি ঘোরাও, হাইওয়ে ধরো— মাঝের মধ্যে হরিণ দেখার এই কি সময়? ক্ষুণ্ণ দীপক আবার ফিরে আসছে কালো পিচের রাস্তাটার উপর। ওই দীর্ঘ পথের শেষে তাঁদের জন্য অপেক্ষা করে আছে অন্ধকার, জলহীন, তৃষ্ণার্ত, রাত্রির দাহ। দয়া তখন তা ভাবেননি।

তাহি! অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছ কেন? পাশের ঘরের দরজা খুললেও একই টানা বারান্দা। দীপকও ঘুমোয়নি, ও বেরিয়ে এসেছে। স্নেহভরে দয়ার কাঁধে হাত রেখে দাঁড়াল দীপক। এত কী ভাবছ? কাল সকালে বিমলি কোম্পানির অফিসে গিয়ে ইঞ্জিনিয়ারকে ধরে আনব তোমার কাছে। জল চাই আমাদের।

দু'হাতে মুখ ঢেকে, রেলিঙে কনুই, দয়া কেঁদে ফেললেন। আমি আর পারি না রে দীপক, আমার শক্তি নেই, ক্লান্ত লাগে সবসময়! যে বিশ্বাস, পরিবর্তনের আশা নিয়ে কাজে নেমেছিলাম, মেয়েদের সংগঠন-মহামণ্ডল-ডাক্তারদের ধরে কনভিকশন করানো— সে বিশ্বাস আমার আর নেই। না কি আছে? জানি না! এখন কেবল ছাড়তে পারি না বলে টেনে যাওয়া, এই মেয়েগুলোকে ফেরাতে পারি না বলে এগনো। ওদের জীবন আরও কঠিন, বল? আরও মেয়ে আসছে, আমার কাছে, তাই কাজের পরিসর বাড়াব— তবু আমি বদলে যাচ্ছি।

দাভোলকর চলে গেলেন। নির্মম মৃত্যু। তার চেয়েও নির্মম মৃত্যুর ঠাট্টা-তামাশা। সোশ্যাল মিডিয়াতে ট্রোলিং। আমরা কী করতে পারলাম? বন্ধুরা? সংগঠনের সদস্যরা কী করতে পারল? দীপকের কাঁধে মাথা রেখে বিড়বিড় করছেন দয়া।

আমি ভয় পাই দীপক। মৃত্যু পরবর্তী এইসব হিংস্রতাকে ভয় পাই। হত্যার চেয়ে ভয়াবহ ওইসব ট্রোলিং। বিজ্রপ। ব্যঙ্গ। সারা জীবনের কাজের গায়ে কাদা ছোটানো। ছিটিয়ে পার পেয়ে যাওয়া। অনেকে বলে, মৃত্যু হলেও আইডিয়া রয়ে যায়। তা হয়তো তাহি! কিন্তু আমি মৃত্যু চাই না। আমি বেঁচে থাকতে চাই। বেঁচে থাকা খুব দরকার। মৃত্যুর পর তো মানুষটাই থাকবে না। দাভোলকর, পানসরে, গৌরী লঙ্কেশ— আমার সামনে দিয়ে যেন মৃত্যুর মিছিল চলেছে— আমার ভালো লাগছে না। অভিজিৎকে একা ফেলে, মেয়েটাকে বিপদের মুখে ঠেলে— কার জন্য কী করবি আমি? যারা জলের কল ভাঙলে টাকা জোগাড় করে সারাবে না, রাস্তায় গাছ পড়লে পড়েই থাকবে, কেউ কড়ে আঙুল তুলবে না, এরাই তো সব লাইন দিয়ে বসে আছে ডাক্তারের ক্লিনিকে, মেয়ে পেটে এলে মারার চক্রান্ত করবে— এদের জন্য কেন আমি কষ্ট করব, তেষ্টায়, গরমে, রোদে— বৃষ্টি থামা অন্ধকারে কয়েকটি জোনাকি ঘুরে বেড়াচ্ছে। কতটুকুই বা তাদের আলো। তবু তারা উড়ছে, ঘুরে বেড়াচ্ছে রাত ভেঙে।

দয়া চোখের জল মুছে নিয়েছেন। দীপক চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে পাশে।

॥ সাত ॥

বধ্যভূমি

যশোবন্ত-এর ধাবা সারারাতই প্রায় খোলা থাকে। বারোটার পর কাজকর্ম, রান্নাবান্না শেষ হয়। বাসনপত্র ধোওয়া-মোছা হয়ে যায়। তবু ঝাঁপ ফেলা বলে কোনও ব্যাপার এখানে নেই, চারদিক খোলামেলাই থাকে। বেঞ্চের উপর চাদর-বালিশ নিয়ে ঘুমোয় তিনটে ছেলে। সন্ধের পর যশোবন্ত চলে যায়, কিন্তু রাতের খাওয়ার পর আবার এসে থাকে কিছুটা সময়। চার-পাঁচ বছর হল, পিছনদিকে নিজের জন্য একটা ঘর বানিয়ে নিয়েছে সে। সেটারও ছাত টিনের। পরিষ্কার বিছানা, টেবিল, চেয়ার, চায়ের জন্য বিজলিওলা কেটলি সব নিয়ে সেটা একটা থাকার মতন জায়গা। মাঝে মাঝে এই ঘরেই রাত কাটায় যশোবন্ত। কিন্তু টাউনের ভিতর তার অল্প ভাড়ার বাসাটিও ছাড়েনি সে। বাবা এখানে এসেছিল অনেকটা পরে, অবস্থা একটু ভালো হলে। এমন একটা কম ভাড়ার ঘরের উপযুক্ত হয়ে উঠতেই বাপ-ছেলের লেগে গেছে কত বছর।

হাজারিবাগ জেলা, বিহার। এখন ওই জেলা পড়ে ঝাড়খণ্ডে। ওখান থেকে পালিয়ে এসে মহারাষ্ট্রের অহমেদনগর এসেছিল বাবা। তারপর এক স্থানীয় চেনা লোকের পরামর্শে শিরুর কাসার। টাউনটা তখন সবে হাত-পা মেলে ছড়াতে লেগেছে। কপালে শান্তি ছিল না লোকটার। ভূমিহারের ঘর থেকে বাইরে পা ফেলে প্রেমে পড়ে গেল ঘাসির মেয়ের। বিয়ে করল বাড়ির অমতে। বউ বাড়িতে এল, কিন্তু যশোবন্ত-এর দাদু-ঠাকুমা নিল না তাকে। বাবা, মাকে নিয়ে নিজেদের ভিটেটেই আলাদা একটা ঘরে থাকত। চাষ আবাদ ছিল, গোরু, মোষ, ছাগল। চলতির কোনও অসুবিধে ছিল না। চার বছরের বালকের স্মৃতি আর কত

SWAMI VIVEKANANDA GROUP OF INSTITUTIONS
(Approved by AICTE & Affiliated to WBUT & WBSCTE)
ISO 9001:2008 Certified Institutes
:- Courses Offered :-
B.Tech (ME,CSE,ECE,EEE)
Polytechnic Diploma (CIVIL, ME, EE, ETCE, ARCHITECTURE, CST)

:- Our Colleges :-
SWAMI VIVEKANANDA INSTITUTE OF SCIENCE & TECHNOLOGY
SWAMI VIVEKANANDA INSTITUTE OF MANAGEMENT & COMPUTER SCIENCE
SWAMI VIVEKANANDA INSTITUTE OF MODERN SCIENCE
SHREE RAMKRISHNA INSTITUTE OF SCIENCE & TECHNOLOGY
Corporate Tie-up with-
NATIONAL & MULTINATIONAL COMPANIES
KARBALA MORE, SONARPUR STATION ROAD, KOLKATA-700103
PH-9831012072, 9831084446, 9831004445; E-MAIL: admin@svist.org; WEBSITE: www.svist.org

গভীর থাকে? তবু যশোবন্তের মনে পড়ে মায়ের সদা সংকুচিত ভাব, ধীরে কথা বলা, ঘোমটার আড়ালে নিজেকে প্রায় ছায়া করে রাখা। মা-র জাত তাদের থেকে আলাদা, 'নিচু' এ কথা শোনাত দাদু-ঠাকুমা-জেঠি। বাবা-জেঠার সঙ্গে এক আত্মীয়ের বিয়েতে গিয়েছিল যশোবন্ত রাঁচির দিকে। মাকে দলে নেয়নি ওরা। দাদু বলেছিল, মাকে নিলে যাওয়া হবে না। জাতের মুখ পুড়বে। মা কি চেয়েছিল যশোবন্ত থাকুক? যাওয়ার আগে ভালো পোশাক পরিয়ে, কপালে কাজল টিপ দিয়ে বুকের মধ্যে জড়িয়ে নিয়েছিল তাকে। সপ্তাহখানেক পর যখন ফিরে এল, ছোট একচালা ঘরখানা পুড়ে ছাই। চারদিকে পোড়া গন্ধ, ছাই উড়ছে বাতাসে। রাঁধতে গিয়ে নাকি উনুনের আগুন বাতার বাঁশে লেগে যায় মায়ের হাত থেকে। মাকে আর পাওয়া যায়নি। আংরা শরীরটা নিয়ে দাহ করেছে ওদেরই বাপের বাড়ির লোক। তারা এসেছিল, লাঠিসোটা ধরে কিন্তু ওই বেড়ার বাইরেই দাঁড়িয়েছিল। ভিতরে ঢোকার হিম্মত হয়নি। হাজারিবাগ জেলায় রণবীর সেনার দাপট মধ্যবিত্তিরের মতো অতটা না হলেও ভূমিহারের ডাকে তারা এসে পড়তে কতক্ষণ।

দাদু-জেঠু এরা ভেবেছিল পোড়া ঘরটা ভেঙে দিয়ে ছেলের হাত ধরে বাবা আবার নিজেদের জন্য তালাবন্ধ করে রাখা ঘরে এসে ঢুকবে। কিন্তু বাবা বাড়ি ছেড়ে দিল। পকেটে মাত্র কয়েকটা টাকা। বাসে চড়ে রাস্তাপুর। সেখান থেকে এলোমেলো ঘুরতে ঘুরতে একদিন অহমেদনগর, তারপর বিড জেলার এই ছোটখাট টাউনই বাবার ভালো লেগে গেল। অহমেদনগর রেল স্টেশনের ধারে পুরি সব্জি বানাত চাকা গাড়িতে, এখানে খুলল খাওয়ার হোটেল। আট বছরের যশোবন্তকে সঙ্গে নিয়ে এল গ্রাম থেকে। দাদুর সঙ্গে দারুণ ঝগড়া হল। ঠাকুমা কাঁদতে লাগল। আজ আর আজি ওদের ভাষায়। নিজের থাকা-খাওয়ার জায়গা নেই, ছোট ছেলেটাকে নিয়ে কোথায় যাবি? তুই যা, ওকে রেখে যা আমাদের কাছে। স্কুলে ভর্তি হয়েছে।

এখানে থাকলে ও একটা খুনি হবে। বলে বাবা হ্যাঁচকা টানে যশোবন্তকে বাড়ির বার করে নিয়ে চলল। যশোবন্ত খুশিই হয়েছিল। বাবা ঘরে নেই। আজা-আজি'র কাছে মন টিকছিল না। স্কুলে ভর্তি হওয়াটা অবশ্য একরকমের পাশবদল। পোড়া ঘরটা ভেঙে সপাট করে দেওয়া হয়েছে, তবু সুযোগ পেলেই, বাড়ির লোককে লুকিয়ে ওখানে একবার যাবেই যশোবন্ত। মার কি সবকিছু পুড়ে গেল? শরীর, হাড়, মজ্জা সে তো চিতায় পুড়েছে। কিন্তু অন্য কোনও চিহ্ন? ঘরকন্নার? রান্নার জিনিস, নাকের গয়না, হাতের কাচের চুড়ির ভাঙা টুকরো। একটা মানুষ পুরো উবে গেল! উবে যায়নি, তাকে ইচ্ছে করে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে শেষ করা হয়েছে। কোনও থানা পুলিস হয়নি। কোনও হাঙ্গামা নয়। সেই উবে যাওয়া মানুষের জন্য যাদের কোনও শোক নেই, তাদের কাছে যশোবন্ত বড় হবে— আহ্লাদি পুতুলের মতন? জামাকাপড় চাদর-বালিশ কিছুই গোছাতে দিল না বাবা, বলল, আমি যেমন থাকি, তুই তেমনি থাকবি। বাপ-ব্যাটায় তোফা আয়েস করব।

গরমকালই ছিল তখন। ছোট্ট ধাবা। একটামাত্র টিন ঢাকা ধামের গাঁথনি। তার সামনের খাটিয়া খালি হয়ে যায় লোকজন চলে গেলে। সেখানে রাতে ঘুমোনো বাবার সঙ্গে। দিনেরবেলা বাসন মাজা, কড়াইয়ে খুন্তি চালানো, রুটির আটা মাখা। ভালোই জমে গেল যশোবন্ত। তখন হাইওয়ে হয়নি। খোয়া-মোরাম গাঁথা ছোট রাস্তা ছিল এখান দিয়ে। বিড যাবার বাস যেত এই রুটে। ধাবার জমিটা খালিই ছিল। হয়তো এটা শিরুর গ্রামের কোনও চারণভূমি ছিল অথবা খেলার মাঠ। ঘাসটাস অবশ্য কখনও দেখেনি ও। কাঁকর, জেগে থাকা পাথরের মাথা, কালো মাটি, বর্ষার জলে ধুয়ে যাবার পর আবার আলো লেগে শুকনো খটখটে হয়ে ওঠে। বাবা আর ছেলে মিলে খাটা-খাটনি করে ধাবাটা বাড়িয়ে তুলছিল। সোজা কাজ নয়। একটা দেওয়াল তুলতে, একটা নতুন চুল্লি বা তন্দুর বানাতে এক বছর। স্কুলে যাওয়া হয়নি যশোবন্তের। এই অঞ্চলের ভাষা আলাদা। এখানে হিন্দি পড়ায় না, পড়ানো হয় মারাঠি।

তবু দুই ভাষারই বইপত্র জোগাড় করে যশোবন্ত নিজের বিদ্যে কাজ চালানোর মতন করে নিয়েছে। হিসেব রাখতে শিখেছে পাটিগণিতের অঙ্ক, পাড়ার এক রিটায়ার্ড দিদিমনিকে ধরে। বাবাকে সাহায্য করতে হবে তো! তারপর একদিন পাড়ার মধ্যে বাসাখানা নিয়েছে বাবা। দু'জনের থাকা আর প্রয়োজনে রেঁধে খাওয়ার মতন একটা জায়গা। বাবা আর হাজারিবাগের কুশমুণ্ডা গ্রামে ফেরেনি। ভিটেমাটির টানকে ছাপিয়ে গেছে পোড়া ছাইয়ের গন্ধ। তার অনুপস্থিতিতে যশোবন্তের মাকে ওরা খোঁটায় বাঁধা অবলা পশুর মতন পুড়িয়ে মেরেছে, এই দাহ কখনও বাবাকে ছাড়েনি।

যশোবন্তকে সবাই ভালোবাসে মহল্লায়, ধাবায় যারা আসে তারাও। হাসিখুশি, কর্মঠ, পরিশ্রমী প্রাণবন্ত কিশোর। নাকের নীচে নতুন গোঁফের রেখা ঘন হচ্ছে। মাথায় ঠাসা ঘন চুল। অচেনা বয়স্ক অতিথি বাবাকে বলে, শম্ভু, তোমার শাগরেদটি বেশ! বাবার গর্ব হয়। মিটিমিটি হেসে বলে, ও তো আমার ছেলে? শাগরেদ কোথায়?

বাবাও চলে গেল হঠাৎই। বুকে যে ব্যথা তীব্র হয়ে উঠেছিল ভোর রাতে, তার চিকিৎসা হবার আগেই। অত রাতে ছোট শহরে কোনও হাসপাতাল খোলা নেই। আর যেরকম ঘামছিল বাবা, তাতে জেলা শহরে নেওয়া পর্যন্ত .... তবু তাই নিল যশোবন্ত। পয়সা খরচ করে, গাড়ি ভাড়া নিয়ে সদর হাসপাতাল। দিনের আলো ফোটার আগেই বাবা শেষ।

কুড়ি বছরের যশোবন্ত রয়ে গেল এখানেই। একা। আবার সবার ভিড়ে মিশে। ক্রমাগত খেটে ব্যবসটা বাড়াতে বাড়াতে। তারপর একদিন রূপালি এল তার জীবনে। এল, কি এল না?

প্রথম বার যেদিন দয়া যেশির বাড়িতে হানা দেয় যশোবন্ত,

19
BURDWAN INSTITUTE OF MANAGEMENT & COMPUTER SCIENCE
BBA (H), BCA (H)
B.Sc. Bio-Chemistry (H)
B.Sc. Bio-Technology (H)
DEWANDIGHI, KATWA ROAD, BURDWAN-2 Just 3KM from Burdwan Railway Station
Help Line : 0342-2622175 / 2859 / 9564911129

দয়ার কৌতূহলী প্রশ্নের উত্তরে বলেছিল, মা না হই, বাপ তো হতে পারি, নাকি?

রূপালি তাদের গলি দিয়ে হেঁটে স্কুলে যেত, সোজা দুটো বেণী পিঠের উপর, বড় বড় চোখ, পাতলা গোলাপি ঠোঁট, বোঁচা নাক, কিশোর যশোবন্ত দেখত বাসার জানলা দিয়ে। তারপর দু'জনের পরস্পরের দিকে তাকানো, হাসি, নাম জানা, নির্জনে দেখা হলে দু'একটা কথা— ছোট শহরে এরচেয়ে বেশি নির্জনতা নেই। রূপালি ওকে বাড়ি নিয়ে গেছে স্কুলবেলা শেষ করার পর, নিজের বইপত্র দেখিয়েছে, গানের হারমোনিয়াম, চা খাইয়েছে। রূপালির বাবা গণপৎ রাও, জেলা সদর কোর্টের পেশকার, মেয়েকে স্পষ্ট কথায় বলে দিয়েছিলেন, দেখ্তি ঠিক আছে, বাড়িতে আসা ঠিক আছে, ধাবাওয়ালা অজাতের ছেলের সঙ্গে বাড়ির বাইরে দেখাশুনো নয়, আর বিয়ে-থার কথা ভেব না বাছা, সেসব হবে না আমাদের সমাজে।

জাত, জাত, জাত।

দেশটাকে ভেঙে টুকরো করে মানুষকে থেঁতলে পিষে চলে যায় এই জাতের রথ।

'নিচু' ঘরের মেয়ে তার মা। খুব হয়েছে। কিন্তু যশোবন্তের জাতও যে মিলছে না রূপালির সঙ্গে এমন একটা অদ্ভুত গণ্ডি যে, ভালোবাসার যে কোনও দু'জন মানুষের জাতই মিলবে না! যশোবন্তের কেউ নেই নিজের এখানে, সত্যিই সে একঘরে। এর মধ্যে নিজের পাড়ার মেয়েকে পথে বার করার হিম্মত নেই তার। জ্বলে পুড়ে যাবে রূপালিরও জীবন। তারচেয়ে যা হবার তাই হোক।

বাইশ বছরের রূপালির বয়স হয়ে গেল টাউনের সবচেয়ে বড় মুদিখানা আর জোয়ার আটা চাক্কির মালিক গজানন পাতিলের সঙ্গে। তার ফোলা ঠোঁট, জলে ভরা চোখ, গুলি খাওয়া বাঘের মতন চেয়ে দেখল যশোবন্ত। আর কিছুই করতে পারল না। কখনও দরকার হলে, আমাকে ডেকো। হাত ধরে ওই কথাটুকু বলা ছাড়া। গজাননের সঙ্গে বিয়ের পর ওদের মহল্লার গলি থেকে টাউনের মধ্যে অন্য এক মহল্লায় চলে গেল রূপালি। খুব দূর নয় এমন নয় যে সেখানে পৌঁছনো যায় না। কিন্তু যশোবন্তের মনে হল খুব বড় একটা দরজা যেন বন্ধ হয়ে গেল বুকের সামনে। রূপালির কাছে তার যাওয়ার কোনও পথ নেই, সুযোগ থাকলেও, সে যাওয়ার কোনও অর্থই নেই আর। আত্মীয়-স্বজন বিহীন ছোট শহরে সাতাশ বছরের যশোবন্ত নিজেকে সম্পূর্ণ গুটিয়ে নিল, ছিন্ন করে নিল রূপালির যাবতীয় স্মৃতি থেকে। প্রচুর পরিশ্রম করতে থাকল হোটেলটাকে দাঁড় করাতে, নতুন খাওয়ার জায়গা বাঁধল, দেওয়াল, সিমেন্টের বেঞ্চি, ফুল-ফলের গাছ লাগাল চারপাশে। হ্যাঁ, আর একটা অদ্ভুত কাজ করল যশোবন্ত। মাথায় ক্যানভাসের ঢাকা দেওয়া একটা ট্রেকার গাড়ি কিনে নিল। মাঝেমধ্যে সে গাড়ি চালিয়ে যাবে এখানে-ওখানে। চালানোর হাত ভালো। যা যা মনের ইচ্ছে, পূর্ণ করে নেওয়া ভালো। বাবা তো চলেই গেল আস্ত বয়সে!

উড়ন্ত ছাই-এর স্মৃতি এখনও তার মনের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। মা গেছে, বাবা চলে গেল অকালে। রূপালি ভালো থাক, বেঁচেবর্তে থাক, তার যেন যশোবন্তকে কখনও দরকার না হয়।

দয়া যেমি এসেছেন শিক্ষর কাসাহে। আছেন তাঁর নিজের অফিস বাড়িটিতেই। গত পাঁচ-ছ মাসে বার দশেক এসেছেন। খুব ইচ্ছে করলেও যশোবন্ত তাঁর কাছে ছুটে যাবে না। আবেগের বশে কাজ করা এক্ষেত্রে সমীচীন নয়। ইন্দুমতী আর তার বর— সাহু, যার মুখ দেখে কোনও কালে কেউ ভাবতেই পারবে না, যে সে কোনও ষড়যন্ত্রের শরিক হতে পারে। এদের তথ্য ইত্যাদি দিয়ে তৈরি করে পাঠানো হয়েছে দয়া তাঁদে-এর কাছে। যশোবন্ত যদি দেখা করতে চায় দয়ার সঙ্গে, সে সাতারা চলে যাবে কিন্তু ভুলেও ভিনের শহরের ভিতরে নয়।

গত এক বছর ধরে উন্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে, এবং যথেষ্ট বিরোধিতাও, ডাক্তার, রেডিওলজিস্ট পুলিশ জেলা প্রশাসন সবার মধ্যেই। আঠি বাড়িয়েছেন দয়া এবং তাঁর টিম। স্টিং অপারেশন-এর সংখ্যা বেড়েছে। কেস উঠছে কোর্টে। সাক্ষ্য নথি প্রমাণ সবশুদ্ধ পেশ হচ্ছে। কিন্তু বেকসুর ছাড়া পেয়ে যাচ্ছে অপরাধী। দয়া যেশির মনে হতাশা ঘন হচ্ছে। বুঝতে পারে যশোবন্ত। কিন্তু এ এক এমন লড়াই, যেখানে মাঝপথ থেকে ফিরে আসা অসম্ভব।

অপারেশন: ইভ্যাকুয়েশন গার্ল চাইল্ড। সংক্ষেপে ইজিসি। ডাক্তার মহলে দুই ধাপ বিশিষ্ট এক শিশুমেধ যজ্ঞের সংক্ষিপ্ত পরিভাষা। ইসিজি বা ইলেকট্রো কার্ডিওগ্রাম যেমন হার্টের রোগ নির্ণয়ের এক পদ্ধতি, ইজিসি— ইভ্যাকুয়েশন গার্ল চাইল্ড তেমন সম্মিলিত অপরাধ চক্রের এক গুপ্ত নাম। আইন করে ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণকে অপরাধ ঘোষণা করা হয়ে গেছে ১৯৯৪-তেই, ২০০৩ সালে তাকে আরও দৃঢ় করার জন্য সংশোধন আনা হয়েছে। আলট্রাসোনোগ্রাফি মেশিন, যা দিয়ে ভ্রূণের বৃদ্ধি আর অবস্থান দেখা হয়, তার নথিভুক্তি বাধ্যতামূলক। ভ্রূণের অবস্থান স্বাস্থ্য ইত্যাদির জন্য আলট্রাসোনোগ্রাফি। কারণ ভ্রূণের জিনগত বা ক্রোমোজম জড়িত সমস্যা থাকতে, হিমোগ্লোবিন সমস্যা থাকতে পারে— পরীক্ষায় তা ধরা পড়তে পারে। কিন্তু ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণ করার জন্য কোনও মেশিন বা টেকনিকের ব্যবহার আইনত নিষিদ্ধ। প্রথমে 'বলে' দেওয়া নিষিদ্ধ ছিল বলে রেডিওলজিস্ট বা ডাক্তার ইশারায় বা ঠারে জানাতেন। এখন আইনে বলা, ইশারা, ইঙ্গিত সবই বারণ। গর্ভধারণের পর আলট্রাসাউন্ড, অ্যামনিও সেন্টেসিস— অর্থাৎ গর্ভজলের পরীক্ষা নিষিদ্ধ ছিল আইনে, এখন, সংশোধনের পর, গর্ভধারণের আগেও শিশুর লিঙ্গ নিরূপণের চেষ্টা বেআইনি করে দেওয়া হয়েছে। আইন অবশ্য কন্যা বা পুত্র কোনও শিশুর কথা বলছে না। লিঙ্গ নিরূপণ করে পুত্রসন্তানকে নির্মূল করাও অপরাধ। কিন্তু সে অপরাধ করার জন্য কারও প্রবণতা নেই। কারণ সংসারে পুত্রসন্তানই একমাত্র কাম্য। আইনকে ব্যবহার করা হচ্ছে কেবল লিঙ্গ নির্ধারণের পর শিশুকন্যার ভ্রূণ নিকাশনের কাজে। ইভ্যাকুয়েশন কার্যক্রমের প্রথম ধাপ দালালের মারফত ভিন জেলার বা রাজ্যের রোগীকে পাইকারি হারে এনে আলট্রাসোনোগ্রাফি করানো— এবং এদের মধ্যে যেসব হতভাগিনী মা কন্যার জন্ম দিতে চলেছেন, তাঁদের পুনর্বার ধরে ভ্রূণকে উৎপাটন করানো। প্রথম ধাপের রেট হাজার, দ্বিতীয়টা তিন থেকে চার হাজার। দাম হচ্ছে করেই কমিয়ে রাখা হয়েছে কারণ পাটিগা—অর্থাৎ শ্বশুর-স্বামী-ভাশুর এবং বউটি আসে জিপ ট্রেকার বোঝাই হয়ে। এক-একটি ক্লিনিক দিনে কেস করে একশো-দেড়শো। জেলায় এমন ক্লিনিকই আছে একশোর কাছাকাছি। রেট কম থাকা সত্ত্বেও বছরে কয়েকশো কোটির ব্যবসা একটি জেলাতেই হয়ে যায়।

দয়ার ভেবে আশ্চর্য লাগে, আইন সংশোধন হয়েছে, চেষ্টা হয়েছে ফাঁকফোকর বোজানোর, এবং সবদিক থেকেই আইন ভঙ্গকারীদের বেঁধে ফেলার চেষ্টা সুনিশ্চিত। এর একটাই অর্থ, দিল্লিতে বসে আইন যাঁরা বানাচ্ছেন, তাঁদের কাছে সব খবরই থাকে। অথচ জেলাস্তরে এসে একজন অপরাধীকেও ধরা অসম্ভব হয়ে পড়ে, যেহেতু তাঁরা শিক্ষিত, পেশাদার, সমাজে তাঁদের প্রভাব অবিসংবাদী, পুলিস, কোর্ট, পাবলিক প্রসিকিউটর সবাই তাদের বন্ধুস্থানীয়।

আইনে বলা আছে সমস্ত ডায়াগনোস্টিক ল্যাব, জেনেটিক কাউন্সেলিং সেন্টার, জেনেটিক ল্যাবরেটরি, আলট্রাসাউন্ড ক্লিনিকের রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক। উদ্দেশ্য হচ্ছে কোথায় কোথায় আলট্রাসাউন্ড মেশিন আছে তার হিসেব নির্দিষ্ট করা।

অথচ এক-একটি সেন্টারে কাজ করছে পাঁচ থেকে দশটি মেশিনও। একটি মাত্র নথিভুক্ত কারা, বাকিগুলি আইনের আওতার বাইরে। সেগুলিতে কী পরীক্ষা হচ্ছে, তার ফলাফল কী কেউ হিসেব রাখছে না। একটি বিশেষ ফর্ম ভরে রাখতে হয় ডাক্তারদের, যার থেকে বোঝা সম্ভব, আলট্রাসোনোগ্রাফি পরীক্ষায় কী জানা গিয়েছিল। সেই ফর্ম, হয় ভরা হয় না ঠিকভাবে, নয় জমাই পড়ে না। আইনের অনুপালন দেখার জন্য কমিটি গড়া হয়েছে জাতীয় স্তরে, সমস্ত রাজ্যে, সব জেলায়। কিন্তু অনুপালনের ফাঁকগুলিকে আইন ভঙ্গের আওতায় আনতে দরকার প্রমাণ সংগ্রহ, নথিপত্র তৈরি, সাক্ষ্য— সেসব কাজ মনিটরিং কমিটি করতে পারছে না। এ কাজ পুলিসের। কিন্তু পুলিস নিতান্ত অনিচ্ছুক।

দয়ার কাজও আরম্ভ হয়েছিল এইভাবে বছর পনেরো আগে, জেলা মনিটরিং কমিটির সদস্য হয়ে। উৎসাহী কর্মী ছিলেন, মেয়েদের সংগঠন করে মঞ্চ ভাঙি বঙ্গের আন্দোলনে তুফান তুলেছিলেন। জেলা সফরে এসে মন্ত্রী আশুতোষ গায়তোন্ডে বলেছিলেন, আমাদের জেলার বদনাম হয়ে যাচ্ছে। কন্যাভ্রূণ হত্যার ভূমি বলে লোকে রটাচ্ছে। তুমি অ্যাকটিভ, বয়স কম, কিছু আরম্ভ করো। মন্ত্রীর সুপারিশে মনিটরিং কমিটিতে জায়গা হয়েছিল তরুণ অ্যাডভোকেট দয়া যোশির। সেই সময়ই বশোবেত্তর সঙ্গে পরিচয় দয়ার— পরিচয় তো নয়, আগুনের গোলার মতো বশোবেত্তর এসে ঝাঁপিয়ে পড়া দয়ার ব্যস্ত অথচ অনুদ্বিগ্ন জীবনে।

যেখানে অপরাধীরা ডাক্তার এবং আইনের অনুপালকরা তাদের ঘনিষ্ঠ সেখানে ক্লিনিকের ভিতর ঢুকে স্টিং অপারেশন করা সহজ নয়। অনেকটা হাঁ করা বাঘের মুখের মধ্যে মাথা পেতে দেওয়ার মতো। মাথাটা আস্ত থাকবে, না কেটে বাঘের পেটে রসে যাবে আগে থাকতে জানা যায় না। একটি দুটি নয়, দয়ার টিম স্টিং করেছে চৌবট্টিটা, বারো পছরে। প্রত্যেকবার দল বদলে নিতে হয়েছে, তাদের তালিম দিতে হয়েছে, এবং শামিল করতে হয়েছে গ্রামের বধূ, পুরুষ, প্রৌঢ়া— সকলকেই। এদের প্রত্যেককে ভালো রকম তালিম দিতে হয়। কথাবার্তায় বেফাঁস কিছু বেরিয়ে গেলেই সবকিছু পণ্ড তো হয়ে যাবেই, এবং ক্লিনিকের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসাও অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। যে গর্ভবতী মেয়েটি 'ডি কয়' বা 'টোপ' হয়ে যাবে, তাকে হতে হবে সাহসী এবং বুদ্ধিমতী। তাকে বাছতে হবে খুব সাবধানে, এবং শেখাতে পড়াতে হবে। আলট্রাসোনোগ্রাফিতে মেয়ে আছে পেটে, দেখার পরই অনেক সময় গর্ভপাতের জন্য পেশেন্টকে টেবিলে নিয়ে যাওয়া হয়, বাড়ির লোকদের সঙ্গে কথাবার্তা অনাবশ্যক। তারা তো সব গ্রামের লোক, সম্বতি দিয়েই বসে আছে। ডি-কয় যদি সচেতন না হয়, তবে বিপদ, তার নিজের এবং স্টিং অপারেশনেরও সাক্ষ্য প্রমাণও লুপ্ত হয়ে যেতে পারে।

প্রথম দিকে ক্লিনিক-হাসপাতালগুলো অতটা বুঝতে পারেনি— তাদের ঘরের মধ্যে ঢুকে কেউ সিঁধ দিচ্ছে, মনের মধ্যে আসেইনি এমন সম্ভাবনা। সেই সব শান্ত, নিরুপদ্রব দিন সঞ্জয়ের স্ত্রী শেফালি, ওদের সাংবাদিক বন্ধুদের স্বামী-স্ত্রী জুটি স্টিং অপারেশনে গেছে এবং নির্বিঘ্নে বেরিয়েও এসেছে। পাঁচ-ছ'টা কেস জেলা আদালতে দাখিল হবার পরও কোর্টে গ্রাহ্য হয়নি ওদের দেওয়া সাক্ষ্য প্রমাণ। দয়া যোশির চাপে পড়ে পুলিস এফআইআর নিয়েছে, এই যা। শুরুর দিকে লুকনো ক্যামেরা নিয়ে গেছে ওরা, মোবাইল তখন সবে এসেছে শহরে, গ্রামেগঞ্জে আসেনি। সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করে জমা দেবে তো পুলিসই। তাদের মুখ অপ্রসন্ন। অখুশি পাবলিক প্রসিকিউটিরও। হ্যাঁ, বেআইনি আলট্রাসোনোগ্রাফি মেশিন আছে বটে, কিন্তু ডাক্তার যে ভ্রূণের লিঙ্গ 'বলে' দিয়েছে, না লিখলেও, তা প্রমাণ করা সহজ নয়। তবু তো প্রথম দিকে 'বলা'টা ছিল। লিখত না কেউই, কিন্তু মুখে বলত; ডাক্তারবাবু, ছেলে হবে তো? এই প্রশ্নের উত্তরে, হ্যাঁ কিংবা না। ধীরে ধীরে মুখ বন্ধ হয়েছে রেডিওলজিস্টদের। কেবল চোখের পলক কাঁপানো, নিজের হাতের তালুতে অবাব লিখে তুলে ধরা, কিংবা বলা, যাও, বাবা পারলি বিশ্বনাথের ওখানে পেঢ়া প্রসাদ চড়িয়ে এসো। দৌড়ে যাও। এসব হল ইশারা-ইঙ্গিত।

ক্যামেরা বা মোবাইল গত কয়েক বছর হল ক্লিনিকের ভিতরে নিয়ে যাওয়া যায়। না দয়া যোশির পরাক্রমের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে অপরাধীদেরও প্রস্তুতি। বড় বড় ক্লিনিকে এখন বাউন্সার থাকে দরজায়। বডি সার্চ হয়। মেয়েদের ব্যাগও তল্লাশি হয়। ছোট ক্লিনিকে এখনও এতটা না হলেও, ক্যামেরাসহ ধরা পড়ার পরিণতি খারাপ হতে পারে। মেশিন সিজ হচ্ছে অনেক। বেআইনি, মানে আনরেজিস্টার্ড মেশিন ধরা সোজা। কিন্তু যে মেশিন সিজ হচ্ছে তার জায়গায় অন্য দুটো মেশিন এসে বসে গেলে বাইরে থেকে পুলিস বা প্রশাসন জানতে পারবে না। টাকার জন্য সংগঠিত অপরাধ, এ একটা সিন্ডিকেটের মতন, প্রত্যেক সিন্ডিকেট সদস্য গোপনীয়তা এবং 'বিশ্বস্ততার' শপথ নিয়ে বসে আছে।

বন্ধ হয়ে যাওয়া এক ক্লিনিকের ভিতরে কাজকর্ম দেখে দয়া একবার জানালেন জেলা প্রশাসনকে। এডিএম বললেন, সে কী, ওটা তো আমি নিজে সিল করে এসেছি। গিয়ে দেখা গেল, সিলিং-এর নোটিস ইত্যাদি সবই আটা আছে, কেবল বাইরের দরজটা নিপুণভাবে বদলে ফেলে রাতারাতি একটা একরকম স্লাইডিং দরজা লাগানো হয়ে গেছে। ওটা স্লাইড করে ভিতরে ঢুকলেই ক্লিনিকের মূল ফটকটা। এডিএমও দেখে তাজ্জব। এমন হাত সাফাই যাদের মাথা থেকে বেরয় তারা কত শক্তি ধরে।

শক্তি তো আছেই। এ হল টাকার গা-জোয়ারি। যাকে বলে সোনার তরোয়াল। কথায় আছে, সব কিছুর পথ আটকানো যায়, বেরিয়ে যায় কেবল সোনার তরবারি। তার সামনে সবাই নতমস্তক। যাদের ছিঁড়ে উপড়ে ফেলে দেওয়া হচ্ছে, তারা সকলেই অজাত মানুষ। শিশুকন্যা। তাদের আওয়াজ নেই, তাদের জন্য কথা বলবে এমন কেউ নেই, নেই তাদের গর্ভধারিণী মায়েরাও। নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে, শ্বশুরবাড়ির হাতে নিগ্রহ বাঁচাতে তারাও নিজেদের সঁপে দিয়েছে পুত্রেষ্টি যজ্ঞের পুজারিদের হাতে। ভাগ্যিস এই অসহায়তাটুকুকে আইনের দৃষ্টিতে অপরাধে যোগদান বলে ধরা হয়নি। তা না হলে এতদিনে কেবল মায়েদের দিয়েই মহানন্দে ভরা হয়ে যেত জেলখানাগুলি। কোটি কোটি টাকার ব্যবসা হচ্ছে শয়ে শয়ে ক্লিনিকে। সারা দেশে। কিন্তু সংগঠিত অপরাধ প্রবণতায় এ জেলার এমন সুনাম যে, বাইরের জেলা থেকেও মানুষদের টেনে আনে।

'ক্লিনিক সিল করা আছে' এই নোটিস আঁটা দরজার পিছনে যে পুরোদস্তুর কাজকর্ম চলছে, এটা জানার জন্য দয়ার মতো একজন বহিরাগত সমাজকর্মী, সাধারণ মানুষের দরকার হয়। অথচ জেলা প্রশাসন, চিফ মেডিক্যাল অফিসার, জেলা সিভিল সার্জন— এঁরা এদের গাড়ি-ঘোড়া, লোকবল সব কিছু নিয়েও, কোনও ফাঁক খুঁজে পান না। আর এই জন্যেই দয়ার মধ্যে জমে ওঠে রাগ আর হতাশা, ক্লান্তিও।

বছর আষ্টেক আগের কথা। নকোশি মানে মিনু আর সাগরই প্রথম 'ডি-কয়' যাঁরা গ্রামের সাধারণ মানুষ। নকোশির বড় মেয়েটির বয়স এখন সাত। মারাঠওয়াড়ার কর্মঠ পরিশ্রমী মেয়েদের জীবনে গর্ভসঞ্চার, গর্ভে সন্তানের বেড়ে ওঠা এবং তারপর প্রসব— এসব কোনও চাঞ্চল্যকর ঘটনা নয়। তাদের নিত্যদিনের কাজকর্ম, ঘরের ও বাইরের, বোঝা বওয়া, কাঠ আনা, খেতে যাওয়া চলতেই থাকে। তবে আজকাল আশাদিদিদের দৌলতে, কয়েকটা চেকআপ, ধনুষ্টংকারের টিকে আর হাসপাতালে প্রসব এই নতুন জিনিসগুলো হয়েছে।

সাগরের মুখেই দয়া শুনেছিলেন, ওর শ্বশুরবাড়ি মানে সাগরের বাবা-মা চাপ দিচ্ছে, পরীক্ষা করাও, ছেলে চাই, ছেলে চাই বংশ রক্ষার জন্য।

সাগরকে দয়া বলেছিলেন, বেশ তো, যাও না, পরীক্ষা করিয়ে এসো মিনুকে নিয়ে। তোমার বাবা-মায়ের কথাও থাকবে, আমাদের কাজও হবে!

সাগর চোখ বড় করে তাকিয়েছিল। দয়া তাঈঁ-এর কাজকর্মের কথা সে জানে, জানে এই মেশিনে জাঁচ নিয়ে তোলপাড় হচ্ছে জেলায়। তবু তাঈঁ-এর কাজে সে আর মিনু জড়াবে জেনে বুকের ভিতর ঢিপ ঢিপ করে উঠেছিল তার।

তোমার বাবাকে নিয়ে যেও সঙ্গে, তুমি আর মিনু যাবে, ডাক্তার কৌশল্যা থাকবেন, উনি আমার বন্ধু, তবে এক্ষেত্রে উনি সাজবেন মিনুর খুড়ি, বাপের দিকের লোক। ওঁর কথা মতন চলবে তুমি আর মিনু, সব শিখিয়ে দেওয়া হবে। একটা মোবাইল ফোন নিতে পারবে সঙ্গে? বিপদে পড়লে ডাক্তার কৌশল্যাই আমাকে ফোন করবেন।

বিপদ! কী বিপদ! শুনে আরও ঘাবড়ে গেল সাগর। নববিবাহিত যুবকের শরীরের পেশিগুলি সাপের মতো খেলে যায় বাহুসঞ্চালনে, কিন্তু বাঘের গুহার ভিতর ঢোকার পর তার শরীরের বল কাজে লাগবে না, সে জানে। লাগবে বুদ্ধির জোর। বুদ্ধিশুদ্ধি গুলিয়ে যায় যদি।

তোমরা ওখান থেকে বেরিয়ে আসার পর পুলিস যাবে। সার্চ, সিজার হবে। বুঝেছ? মিনুকে বোঝাতে গিয়ে হিমসিম খেতে হল সাগরকে। সে ভয় পায়, দেওয়ালে মাথা ঠোকে আর বলে, কিছুতেই যাব না। এমপাতালে। ওরা আমাকে জেরা করে খালাস করিয়ে দেবে। এমন যে হয় না, করতে গেলে ওদের নিদান সাগর বা তার বাবাকে বলতে হবে, এটা বোঝালেও কাম্য থামে না নকেশি অর্থাৎ মিনুর। শেষে দয়া আর কৌশল্যাকে আসরে নামতে হল।

—তোমার আর সাগরের যে বাচ্চা আসছে, সে ছেলে না মেয়ে তুমি জানতে চাও?

—না, তাঈঁ!

—কিন্তু তোমার শ্বশুর-শাশুড়ি জানতে চায়। সাগর চায় না। ছেলেমেয়ে যাই হোক, সে খুশি।

—আমিও, আমিও খুশি!

কিন্তু জাঁচ করে যদি মেয়ে পাওয়া যায়, তবে তোমার শ্বশুরবাড়ি চায় বাচ্চাকে খালাস করে দিক ডাক্তার। পয়সা পেলে ডাক্তাররা দুটোই করবে, জাঁচ আর খালাস। ওরা মেয়েদের জন্মাতে দেবে না। এটা দেশের আইনে মানা। তুমি চাও না যে সব পড়লিখা লোক এই মেশিনের কারবার করছে, খালাস করছে একটা জীবন্ত বাচ্চা শুধু এই জন্য যে, সে মেয়েসন্তান— এদের শান্তি হোক?

—শান্তি হোক, তাঈঁ খুব কড়া শান্তি হোক, জেল হোক!

— তাই আমরা তোমাকে নিয়ে যেতে চাই, মিনু! দয়া কখনও ভুলেও 'নকোশি' নামে ডাকে না ওকে, সাগর দেখেছে।

—তুমি যাবে, নিজের চোখে দেখবে বড় বড় হাসপাতালের ভিতর কী হচ্ছে, ফিরে এসে গ্রুপের মেয়েদের বলবে, আর তোমার সন্তানের জাঁচ রিপোর্ট যেমনই হোক, লিখে হোক, মুখে বলে হোক, আমরা দাখিল করব কোর্টে পুলিস সে সব তলব করে নেবে। কেমন?

—ওরা কি আমাকে আর সাগরকে মেরে ফেলবে? হো হো করে হাসলেন দয়া। এই সরল মেয়েটাকে বলা যাবে না যে ওই চক্রের শত্রু হলেন দয়া— যাঁর মৃত্যু কামনা ওরা রোজ করছে। সাগর আর মিনু তো নিমিত্ত মাত্র! আর দুটো অবলা শিকার। ওদের বাঁচিয়ে রাখলেই ক্লিনিকগুলোর লাভ। আবার গর্ভ ধরবে মিনু, আবার জাঁচ করাবে আবার একটা রক্ত মাংসের ডেলা খসে যাবে আস্তাকুঁড়ে...

—মুখে বললেন, আরে, না না, মারবে কেন! টাকা রোজগার করেই ওরা খুশী।

এখন তো বড় তালেবর নে গেছে সাগর। যশোবন্ত ধাবাঙলার কাছ থেকে বাইরের পার্টি জাঁচ করাতে আসার খবর নিয়ে তাঈঁকে দেয়। যশোবন্ত আবার ওর ছেলেগুলোকে ট্রেনিং দিয়ে দুরুস্ত করে রেখেছে। বাইরের লোকজন ধাবায় খেতে এলে হেসে গল্প করে খবর বার করে নেওয়ায় ওরা এখন দারুণ ওস্তাদ। দয়া তাঈঁ বলেন, তোরা সব আমার আর্মি। যেমন ইন্ডিয়ান আর্মি। তোরা তেমন এই জেলার নিজের আর্মি। আর্মি যেমন দেশকে পাহারা দেয়, শত্রুর হাত থেকে বাঁচায়, তোরা তেমন মেয়েদের ধুপি ডাক্তার আর ক্লিনিকের হাত থেকে বাঁচাবি, ওদের জন্মাতে দিবি— তারপর আমরা সবাই মিলে ওদের বড় করব।

মেয়েদের পৃথিবীর মাটিতে জন্মাতে দেওয়া— কালে কালে এটাই হয়ে উঠল কত কঠিন কাজ, সাগর আর মিনু ভেবে দেখেছে। যদি বা বড় হল, তাকে স্কুলে পাঠানো, পড়াশুনো শেখানো। যদি অল্প বয়সে বিয়ে ঠিক হয়ে যায় সেই বিয়ে ঠেকানো। স্কুলে পড়া মেয়েদের দল তৈরি, তাদের হাতে-কলমের কাজ শেখানো, তাদের নিয়ে নাটক করা, ফিল্ম করা, আর গ্রামে গ্রামে সেই সব নাটক, সিনেমা ছড়িয়ে দেওয়া। দয়া তাঈঁ এসব রোজ করে চলেছেন। প্রতিদিনই যুদ্ধের মহড়া চলেছে তাদের আশপাশে।

কিন্তু সাত বছর আগে যখন সাগর আর মিনু একেবারে আনাড়ি ছিল, তখন দুরু দুরু বুকে, পায়ে পায়ে জেলার সবচেয়ে বড় হাসপাতালটাতে পৌঁছে গেছিল। ওখানেই সবচেয়ে জরুরি কাজ তাঈঁ-এরা। কৌশল্যা ডাক্তার কেমন সেজেছিল! মাথায় গাঁওলি বুড়িদের মতো খোঁপা, তাতে আবার হলুদ ফুল, কাছা দেওয়া শাড়ি, হাতে চুড়ি, গলায় পুঁতির মালা— ওরকম হাঁসের মতন দুলে দুলে কোনও দিন হাঁটেন না তো ডাক্তারদিদি! চোখে মোটা কাচের চশমা, কিছু শুনলে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকেন, যেন বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে। যাইহোক, সাগর নিজেই বউকে নিয়ে যাচ্ছে, জাঁচ করাবে বলে, মানে গোঁয়ার ছেলের সুমতি হয়েছে, এই মনে করে সাগরের মা-বাবা সঙ্গে আসতে চাননি। সেটা একদিক দিয়ে সুবিধেরই হল। কৌশল্যা ব্লাউজের ভিতর মোবাইলটা রেখেছিল। মোবাইল আছে? বলে গেটের উর্দিপরা লোকটা খোঁকিয়ে উঠতেই এমনভাবে ঘাড় নাড়লেন ডাক্তার যে, লোকটা আর কিছু বলল না। বুকের ভাঁজে ওই জন্য তো রাখা, পুরুষ মানুষ হাত দিতে পারবে না। সাগরকে ওরা জাঁচ মেশিনের ঘরে ঢুকতে দিল না, কিন্তু কৌশল্যা ডাক্তার গেল সঙ্গে। তাকিয়ে রইল মেশিনের পর্দার দিকে। পর্দায় দেখাচ্ছে, আর ওর পেটের উপর ঘুরছে হাতে ধরা যন্ত্রের নলটা, তাতে আঠা লাগানো বলে পেটের উপরটা চ্যাট চ্যাট করছে, বুক ধড়ফড় করছে মিনুর, যেন ওই চুরি করতে গেছে এবং ধরা পড়ে যাবে। কোমরটা বাঁকিয়ে মাথা তুলে ডাক্তার যেই জানতে চেয়েছে, কী হ'ল, ছেলে না মেয়ে? অমনি খোঁচিয়ে উঠেছেন মেশিনের ডাক্তার। খুব শখ না জানার? তাহলে বসে থাকো যখন মঞ্জু ম্যাডাম আসবেন, তখন বলবেন।

ডাঃ মঞ্জু পাটিল। স্বামী ডাঃ বৃন্দাবন পাটিল। জেলার সবচেয়ে বড় চার মহলা হাসপাতালটি পেশেন্টে রমরম করছে। দিনের দেড়শো থেকে দুশো কেস হয় এখানে। তিরিশের বেশি আলট্রাসোনোগ্রাফি মেশিন। শতখানেক গর্ভপাত। এই দুই মহীরুহ— মহীরুহই বটে কারণ তাঁদের ডালপালায় লালন-পালন হয় কত যে এজেন্ট-দালাল, ছোট-বড় রেডিওলজিস্ট আর স্পেশালিস্ট ডাক্তারের— এঁদের কেশাগ্র, নখাগ্র ছোঁওয়া দেবতার পক্ষেও অসম্ভব। স্বয়ং চিফ মেডিক্যাল অফিসার তাঁর

মেয়ের অজাত শিশুকন্যার ভ্রূণের গর্ভপরীক্ষা এখানে করিয়েছেন এবং তৎপরবর্তী গর্ভপাতও। ডিআইজি পুলিসের পরিবারের লোক এসেছেন এখানে এবং জেলার মন্ত্রী এমএলএ-দের আত্মীয়-পরিজন। যতবার স্টিং-এর চেষ্টা হয়েছে, হয় পুলিস এসে পৌঁছতে পারেনি, নয় কোর্টে খারিজ হয়েছে সাক্ষ্য-প্রমাণ।

ঠিক আছে ডাক্তার ম্যাডাম আসা পর্যন্ত বসি। বসি বলল বটে কৌশল্যা, কিন্তু বসল না। মিনুর হাত ধরল, আর সাগরকে ইশারায় বলল, তুমি একলা যাও— এত বড় ক্লিনিকটা ঘুরে দেখতে হবে, কোথায় কী হচ্ছে। পকেটে স্কেচ পেন সাগরের, কৌশল্যারও। যেখানে যেখানে যাচ্ছেন, লেডিস টয়লেটে, টয়লেটের সিটে, অ্যাবরশন রুমের পার্টিশনের উপর দ্রুত লিখে রাখছেন আসার দিন তারিখ, নিজের নাম সই করে। ডঃ মঞ্জু পাটিল আসার পর তথ্য-প্রমাণ কিছু পেলে এগুলি সার্চ সিজারে কাজে আসবে।

ডঃ বৃন্দাবন বসেন একতলায়। রিসেপশনের পাশের ঘরে। চোখে চশমা, মোটা মোটা, ভালোমানুষ চেহারার আড়ালে একটি রাক্ষস। জনশ্রুতি আছে সোনার ডিমপাড়া হাঁস, নিধন যজ্ঞের অন্যতম নেত্রী মঞ্জু পাটিল প্রতি রাতে স্বামীর হাতে নিগৃহীতা হন। কিন্তু দুপুরের পর হাসপাতালে একবার ঢুকলে তিনি অন্য মানুষ। হাসপাতালের ডাক্তার সিস্টার তাবত ব্যক্তি তাঁর ভয়ে কাঁটা, বৃন্দাবন পাটিলও। মঞ্জুকে দেখলে ডাক্তার বলে মনে হবে না, কপালে চন্দনের রেখা, খোলা চুলে জবা ফুল, ঢুলু ঢুলু চোখ তিনি যেন এক মগ্ন পূজারিণী।

রাঙা রাঙা চোখ খুলে তিনি যাঁর দিকে তাকান, দৃষ্টি প্রসন্ন হলে তার বরাত খুলল, আর ক্রুদ্ধ হলে তার মৃত্যু নিশ্চিত!

যদিও ডি-কয়, তবু গর্ভবতী মেয়ে। কৌশল্যা এক ফাঁকে মিনুকে একতলার বেঞ্চে বসিয়ে পাতাল কুঠুরিতে নেমে গেল। ইশারায় সাগরকেও বলেছে তুমিও এসো। এখানেই ভয়ঙ্কর দৃশ্যটা দেখেছিল সাগর— যা সে না পারবে কোনওদিন ভুলতে, না কখনও নিজের স্ত্রীকেও বলতে।

বড় বড় চারটে চৌবাচ্চা, অগণ্ডীর। চারটে বিশাল কুকুর, ওখানেও হুক চেন দিয়ে বাঁধা। ওটি থেকে ট্রেতে এনে চৌবাচ্চায় ফেলা হচ্ছে নিষ্কাশিত কন্যাভ্রূণ, মৃত নয় তারা, ধড়ফড় করছে জল থেকে সদ্য তোলা মাছের মতন। প্রাণ ছেড়ে যায়নি তাদের, বাঁচার আকুতিও। চারটি কুকুরের পক্ষে বেশি এত খাবার। তবু তারা তো মানুষের অন্নদাস কুকুর মাত্র, প্রাণপণ চেষ্টা করছে ভ্রূণগুলি খেয়ে শেষ করতে। কর্মকাণ্ডের ছিটে ফোঁটা যাতে বাইরের আবর্জনা স্তূপে গিয়ে না পৌঁছয় তাই এই ব্যবস্থা। নেমে আসার সময় হয়তো দুপুরের টিফিনের বিরতিতে প্রহরীরা ছিল না। তাদের দু'জন আগে-পিছে এসেছে কেউ দেখতে পায়নি। কৌশল্যা অভিজ্ঞ ডাক্তার। তবু শরীর কাঁপছে, হাত কাঁপছে, কপালে ঘাম, সাগর আর তাঁর দু'জনেরই। কাঁপতে কাঁপতে নীচের সিঁড়ির ধাপে পৌঁছতেই সিকিওরিটির চিৎকার শোনা গেল— এই ওখানে কে! নীচে গেলি কী করে!

কাঁদো কাঁদো গলায় কৌশল্যা বললেন, বাথরুম খুঁজতে এসেছি, বাবা, বুড়ো মানুষ... সেই কখন থেকে আর পারছি না—

যাও, যাও ওপরে যাও, শিগগির।

প্রাণ হাতে করে ওপরে এল ওরা দু'জন।

ক্লিনিকের পাতাল কুঠুরির কথা ডঃ কৌশল্যা লোকমুখে শুনেছিলেন— এই প্রথম দেখলেন। নানা সূত্র থেকে পাওয়া টুকরো টুকরো খবরের অংশ জুড়ে মনের মধ্যে যে ছবি তৈরি হয়েছিল, তা দেখা গেল নিজের চোখে। সঙ্গে থাকল মোবাইলে কিছু ভয়েস রেকর্ডিং— আলট্রাসোনোগ্রাফি রুমের। যেখানে রেডিওলজিস্ট বলছেন— অপেক্ষা করুন, ডাক্তার মঞ্জু পাটিল

শারদীয়া, দীপাবলী ও
ছট্‌পূজার শুভেচ্ছায়...

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা ব্যানার্জীর অনুপ্রেরণায়
বিধায়ক শ্রী অরুণাভ (রাজা) সেন -এর তত্ত্বাবধানে
মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
বাগনান ১নং পঞ্চায়েত সমিতি
বাগনান, হাওড়া

বলবেন। কী বলবেন, অবশ্য স্পষ্ট নয়।

ডাক্তার পাটিল বিকেলে এলেন। ততক্ষণে খিদে-তেষ্টায় কাতর মিনু, সাগর, কৌশল্যা সকলে। কোথাও বেরতে পারেনি এতক্ষণ। পোরাওয়েট চাপা দেওয়া সোনোগ্রাফি রিপোর্টে একের পর এক চোখ বোলাচ্ছেন মঞ্জু পাটিল। ভিতরে কেউ যেতে পারবে না। বাইরে চূড়ান্ত স্তব্ধতা। দূর-দূরান্তের লোক যারা আসে, তারা দু'এক রাত ধর্মশালা-হোটেলে থাকার ব্যবস্থা করেই আসে। না, ভ্রূণের লিঙ্গ নিয়ে কিছু বলেন না ডঃ মঞ্জু পাটিল। সব রিপোর্টের মধ্যে অর্ধেক ভুলে নিয়ে বললেন, এদের কাজ করিয়ে দাও। নার্স ডাক্তর, কৌশল্যাকে। অ্যাবরশন আজ করাবেন না আগামীকাল।

আজ তো হবে না বাছা, বাড়িতে বলা হয়নি। আমরা কাল আসি বরং। বউটা খিদে-তেষ্টায় নেতিয়ে পড়েছে।

যা ভালো বোঝেন করবেন। বিরস মুখে নার্স চলে গেল।

বেরিয়ে এসে দয়া তাঈকে ফোন করলেন কৌশল্যা ডাক্তার। প্রাণ হাতে করে ফোন নিয়ে ফেরা। এবার আর বুকের মধ্যে নয়, সায়ার পকেটে ভরে। বেরবার সময় মোটাল ডিটেক্টর এড়িয়ে বেরনো।

অনেক রাত হয়েছিল সেদিন। দয়া তাঈ নিজে গেছিলেন পুলিস স্টেশন। সঙ্গে মিনু, সাগর, কৌশল্যা। মঞ্জু পাটিল ভ্রূণের লিঙ্গ নিয়ে কিছু না বলে সোজা অ্যাবরশনে পাঠাচ্ছিলেন। সেই সময় বাইরে চলে এসেছে ওরা। দয়ার চোখে ওসিকে সে রাতে কথা বলতে হয়েছিল এসপি'র সঙ্গে এবং এসপি নিশ্চয়ই ডিআইজি ও মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছিলেন। কারণ, পুলিস আসতে রাজি হল না। সাক্ষ্য-প্রমাণ তথ্য কিছুই রেড, সার্চ বা সিজারের পক্ষে যথেষ্ট নয়। সারা দিনের পরিশ্রম, মিনুর হয়রানি সব বিফলে গেল। দয়া তাঈ মুষড়ে পড়েছিলেন। কিন্তু সাগর আর মিনুর মনে হয়েছিল, তারা যে জীবন নিয়ে ফিরে এসেছে এটা কি যথেষ্ট নয়? পারলি বিশ্বনাথকে প্রসাদ চড়াতে হবে কালই!

এত বছর পরে ওই দিনটি ভোলেননি দয়া, সাগর, মিনু, কৌশল্যা কেউই। সাত বছরের মেয়ে পরী যখন বই-খাতা ছড়িয়ে বসে প্রাইমারি স্কুল থেকে ফিরে, তার মুখের দিকে কপালের দিকে চেয়ে মিনুর মনে হয়, যেন সত্যিই মৃত্যুর মুখ থেকে মেয়েকে ছিনিয়ে এনেছে ও! এটাই জীবনের সবচেয়ে সেরা ছবি!

॥ আট ॥

দুর্গা

রাতের খাওয়া হলে মাঝে মধ্যেই পাশের মহল্লায় একটি বাড়িতে যায় যশোবন্ত। ধাবা থেকে দূরে কিন্তু ওর নিজের বাসা থেকে কাছে। যে ট্রেকারটা কিনেছিল মধ্য যৌবনে, সেটা খুবই পুরনো ঝরঝরে হয়ে গেছে, এখন আর চলে না। তবু ধাবার বাইরের হাতার ভিতর সেটাকে রেখে দিয়েছে যশোবন্ত। নিজের হাতে সাফসুতরো করে। ওটা ওর কাছে একটা লড়াইয়ের হাতিয়ার। চোখের সামনে থাকলে মনের মধ্যে একটা আনন্দ আর গর্বের স্রোত বয়ে যায়। রাতের পথঘাট ফাঁকা থাকে ছোট শহরে। সাইকেল চালিয়ে যশোবন্ত যায় সেই বাড়িতে যেখানে বিয়ের পর বউ হয়ে ঢুকেছিল রূপালি। গত কয়েক বছর দু'তিন বার যেত, এখন তো প্রায় রোজই যেতে হচ্ছে। দুর্গার বিয়ে ঠিক হয়েছে। তোড়জোড় গোছগাছ চলছে। রূপালি ঘরের কাজ সামলাচ্ছে সব, কিন্তু বাইরের দৌড়ঝাঁপ, ভারী জিনিস টানাটানি— যশোবন্ত বলেছে, তোমাকে ওসব করতে হবে না। আমাকে লিস্ট দিয়ে দাও, বলে দাও কোথা থেকে কী আনতে হবে, কাল কাছে যেতে হবে। শরৎ এসে গেছে। দশহরা দীপাবলির পরই এ অঞ্চলে ঝপ করে এসে পড়বে শীত। ডিসেম্বরে রূপালির মেয়ে দুর্গার বিয়ে ঠিক হয়েছে। গজানন পাতিল মারা গেছে বছর পাঁচেক হল। ওজন খুব বেড়েছিল, উচ্চ রক্তচাপ, খাওয়া-দাওয়াতেও নিয়ম-নিষেধ মানত না, হাঁটাচলা, ব্যায়াম কিছুই নয়। ব্যবসা সাধ্যমতো দেখাশুনো করছে রূপালি, তবে আগের মতো জমজমাট নেই সবকিছু আর। রূপালির শরীরেও বয়সের ভার জমেছে, সাদা হয়ে আসছে মাথার চুল, কিন্তু তার মনটির কাছেই যেহেতু যশোবন্তের ফেরা তাই সে এসব কিছুই দেখে না। রোজই যে তাদের কথা হয় তাও নয়, কেবল মুখোমুখি বসে থাকা চুপচাপ, পরস্পরকে স্পর্শ না করে, আর ভাবা, কী সৌভাগ্য, যে আমরা আবার কাছাকাছি এলাম। ছোট শহর, তবে এখানে পাড়া-প্রতিবেশীর জিভ লব লক করে না। সবাই যশোবন্তকে চেনে। তার হাসি মুখ, উদার মন, বিপদে সাহায্য করার জন্য সে সর্বদা হাজির। গজাননের মৃত্যুর সময়, এবং তার আগেও, ব্যবসা প্রায় মাথায় তুলেই, লঘ্বঘ্রে জিপ নিয়ে যথেষ্ট ছোটছুটি করেছে যশোবন্ত। কিন্তু জেলা সদরে নিয়ে গিয়েও বিশেষ লাভ হল না। নিজের বাবার বেলা, পঁচিশ বছর আগে, হাসপাতালে পৌঁছতে পারেনি ও; এবার হাসপাতালে পৌঁছল বটে, সেখানে না আছেন ভালো ডাক্তার বা ইনটেনসিভ কেয়ার। যা হওয়ার তাই হয়েছে— একটা অঞ্চল যখন নিজের সমস্ত মনোযোগ আর শক্তি কেবল গণপতি আর বদ্ধাকরণে নিয়োগ করে, তখন বাকি চিকিৎসা গোল্লায় যায়— কারণ টাকার স্রোত বইছে অন্যদিকে!

একটা সময় ছোট শহরে দমকল বা অ্যাম্বুলেন্সের মতন দরকারি হয়ে উঠেছিল যশোবন্তের ক্যানভাস ঢাকা ট্রেকার গাড়ি। তা হয়ে গেল বছর কুড়ি। তারপর তো নতুন ভাড়া গাড়ি ট্যাক্সি জিপ বেড়েছে ক্রমে ক্রমে। কেউ কেউ পয়সা দিয়ে ভাড়া নিতে চাইত ট্রেকারে। দেয়নি যশোবন্ত। এক, সে অন্য ড্রাইভারের হাতে গাড়ি ছাড়বে না। দুই, পয়সার জন্য গাড়ি লাগাবে না সে। অসুস্থ মানুষকে হাসপাতালে পৌঁছনো, অথবা প্রসবের কেস। রাত-বিরেতে ডাকলেও যশোবন্ত যাবে। জান লড়াবে, কিন্তু বিয়েবাড়ি, পার্টি, তামাশার মজলিসের জন্য গাড়ি দেবে না।

রূপালি হাসতে হাসতে বলে, আচ্ছা, তুমি কি আমার জন্যই কিনেছিলে গাড়িটা?

না, তা কেন! অন্যমনস্ক হয়ে যায় যশোবন্ত। যদিও ঠিক সেই কথা ভেবে নয়, তবু মনের গহনে কোথাও যেন এক দুর্মর আশা লুকিয়েছিল যে, একদিন স্টিয়ারিংয়ে বসবে যশোবন্ত আর তার পাশে রূপালি। শরতের দিনগুলি যেন স্বপ্ন ও মায়া নিয়ে আসে। রৌদ্র ঈষৎ ম্লান, আর বৃষ্টিপাতের শেষে বর্ষা মিলিয়ে গেছে। আকাশ উন্মুক্ত, নীল। দুর্গাপুজা আসছে। তাদের ছোটবেলায় কুশমণ্ডি গ্রামে দুর্গাপুজো হতো। হাজারিবাগ টাউনের বারোয়ারি পুজোর জাঁকজমক শিকড় ছড়িয়ে ছিল গ্রামাঞ্চলেও। ছোটনাগপুরের নানা জায়গায় প্রবাসী বাঙালিদের পরিবার তখনও ধাক্কা খেয়ে বেরিয়ে যায়নি। রাঁচি, সিংভূম, পালামৌতে পুজো হতো। আর কুশমণ্ডির পুরনো বাঙালি পরিবারের দুর্গাপুজো দেখতে যেত গ্রামের সকলে। বাঙালিবাবুদের অবস্থা তখন পড়তির দিকে। খিচুড়ি ভোগ হতো অষ্টমির দিন, টম্যাটোর চাটনি, বেগুন ভাজা। সামান্য আয়োজন। তবু শিশু যশোবন্ত-এর মনে হতো অমৃতের ভোজ। একবার গরম খিচুড়িতে তার জিভ পুড়ে গেছিল, মা সোহাগ গরম করে মধু দিয়ে লাগিয়ে দিয়েছিল। এ অঞ্চলে দুর্গাপুজো হয় না। দীপাবলির উৎসবই প্রধান। দু'এক জায়গায় দশমীর আগের দিন যে অর্চনা হয়, তাতে এক চারহাত, সিংহবাহিনী দেবীর মূর্তি থাকে। সে রুপা আবার যশোবন্তের শৈশবের স্মৃতির সঙ্গে মেলে না। আজ রূপালিদের বাড়িতে ঢুকতেই হইচই করে দুর্গা বেরিয়ে এসেছে। কোনও এক কলেজ বান্ধবীর সঙ্গে খুনসুটি করতে করতে। গোড়ালি পর্যন্ত লম্বা স্কার্ট, উপরে টি-শার্ট, মাথার বেণিটি

কোমরের কাছ পর্যন্ত ঝুলছে। রূপালি খুব যত্ন নেয় মেয়ের চুলের, দিনের মধ্যে কতবার যে টেনে আঁচড়াচ্ছে, তেল লাগাচ্ছে, বেণি করছে, বাইশ বছরের মেয়ে, দেখে মনে হয় উনিশ কুড়ি ছাড়াচ্নি, মায়ের শ্যামলা রং আর ছিপছিপে চেহারা পেয়েছে। ওকে দেখলে মনে হয় কিশোরীবেলার সেই রূপালিই যেন।

দুর্গার বাচ্চাবীটি খুব মিশুকে, সে যশোবন্ত বাড়িতে ঢুকতেই ঝাঁপিয়ে এল, কাকা, দুর্গাকে কী দেবেন জন্মদিনে? এবারই তো লাস্ট জন্মদিন বাপের বাড়িতে— ও একটা ভালো মোবাইল চায়!

ধ্যাৎ, রেগে লাল হল দুর্গা! আমি আবার মোবাইল কখন চাইলাম! না, কাকাও মিথ্যে কথা বলছে! সে তো বুঝলাম, কিন্তু লাস্ট জন্মদিন কেন? দুর্গার জন্মদিন বাপের বাড়িতেই হবে সব বছর। ওর শ্বশুরবাড়ির সবাই এখানে আসবে।

দেবীপক্ষ আরম্ভ হয়নি, জন্মদিনের তোড়জোড় আরম্ভ হয়ে গেছে মেয়ের! ঠাট্টা করে বললেও, গলায় খুশির যে আভাস ফোটে তা লুকোতে পারে না যশোবন্ত। দেবীপক্ষ, অষ্টমীর রাত, দুর্গার জন্ম সবই তার কাছে বিশেষ দিন। যশোবন্তের একলা জীবনকে পুরোপুরি পাল্টে দিয়েছে এই সব তিথি। নতুনভাবে বাঁচা আরম্ভ হয়েছে তার।

বাইশ বছর আগেকার সেই সন্ধেটা স্পষ্ট মনে আছে যশোবন্তের। কথা, স্মৃতি সব ফুটে আছে, আকাশের গভীরে যেমন নক্ষত্রেরা ফুটে থাকে। পুজোর সময়টা এই মন খারাপটা বাবা চলে যাবার পর থেকেই গাঢ় হয়ে এসেছে। সে যে অন্য একটা প্রদেশে আছে, নিজের দেশে নেই, সেটা আরও বেশি করে মনে পড়ে এই সময়। সে বছর তো আরও বিষণ্ণ যশোবন্ত, রূপালির বিয়ে হয়েছে বছর দেড়েক হ'ল। ওদের বাড়ি কিংবা শ্বশুরবাড়ি কোথাও আর যেতে পারেনি যশোবন্ত। কোনও নিষেধ নেই, তবু কোথাও যেন বাধে। গজানন পাতিল মানুষটির খুব সুনাম নেই বাজারে, ব্যবসায়ী মানেই যে খারাপ তা নয়। তবে শিক্ষা-দীক্ষা রুচির অভাব তার আচরণে স্পষ্ট। কয়েকবার দেখেই জেনেছে যশোবন্ত। শিক্ষা-দীক্ষা তো যশোবন্তেরও নামমাত্র। কিন্তু ও শিখেছে অনেক কিছু জীবন থেকে। কেবল ওপরের পালিশ নয়। দয়ামায়া করুণা সহানুভূতির যতটুকু অয়াস্ত করা যায়। রূপালিকে বহু বছদিন দেখে না যশোবন্ত। এ কেবল বিরহ নয়, এর সঙ্গে মিশে আছে বিপুল উদ্বেগ। ও শুনেছে রূপালি সন্তানসম্ভবা। প্রসবের সময় কী হবে, কতখানি কষ্ট, কোন হাসপাতালে ভর্তি হবে, এসবের কিছুই স্পষ্ট না জেনে তার মন উৎকণ্ঠায় ভরে উঠতে থাকে। গজাননের বাড়িতে কাজ করে এক প্রৌঢ়া দাই, তার কাছ থেকে সাবধানে যতখানি পারা যায় খবর সংগ্রহ করে রাখে যশোবন্ত। আচ্ছা, গজানন তো আছে। ওর স্বামী। শ্বশুর-শাশুড়িও আছেন। তাঁরা নিশ্চয়ই নিজেদের বউয়ের যত্ন নেবেন। মারাঠা পরিবারে বিশেষত যারা এখানও গ্রামে বহাল রেখেছে চাষবাস আর শহরে বিষয় সম্পত্তি, যশোবন্ত জানে মেয়েদের অবস্থা ভারবাহী পশুদের চেয়েও খারাপ। অতি মাত্রায় রক্ষণশীল এদের পুরুষেরা। মেয়েরা বাড়ির বার হলে আপত্তি, পড়াশুনো জিনিসটা অপ্রয়োজনীয়। মেয়েদের চালচলনে কোনও কমতি না থাকে, তাতে পরিবারের আব্রু ইজ্জতে ঘা পড়ে। অথচ মেয়েসন্তানকে জন্ম থেকেই বঞ্চিত করে রাখে মারাঠা পুরুষ। পুত্রসন্তানের আকাঙ্ক্ষাই তাদের জীবনের মহত্তম বিলাস।

নম খারাপ করে ঘরে বসেছিল যশোবন্ত। ধাবাটা এতদূর, এ মরশুমে সন্ধের পর লোকজনের আসা-যাওয়া কম। দুটো ছেলেকে সামলাতে বলে ঘরে এসেছে ও, অথচ মনটা অস্থির হয়ে আছে। দাই বলেছে, রূপালির সন্তান জন্মের তারিখ পড়েছে চতুর্দশীর দিন। কিন্তু এ তো প্রথম সন্তান। এর জন্ম কিছু আগে হতে পারে। বাড়ির লোকেরা জানে? হাসপাতাল ঠিক হয়েছে? হঠাৎ যদি কিছুর হয় মাঝারাতে, তখন? মুখে দোক্তা ফেলে বসন্তের দাগওলি হাসিতে বুজিয়ে দিয়ে দাই হেসেছে। আরে তুমি যে পাগল হয়ে গেলে দাদা! পাতিল ভাই কেমন ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোয় আর দোকান করে! সবই ভগবানের হাত! মানুষ আর কত ভাববে বলো? অন্ন কিছু খেয়ে বাইরের জামাকাপড়ে বিছানায় শুয়ে পড়েছিল যশোবন্ত। হঠাৎ মাঝরাতের পর দরজায় ধাক্কায় ঘুম ভেঙে গেল তার। ডাকাত? এ মহল্লার রাস্তাঘাট নিরিবিলি, কিন্তু ডাকাত তো কখনও পড়েনি! তারপর মনে হল, দূর, এসব কী ভাবছে সে! তার বাড়িতে ডাকাত পড়ার মতন আছে কী আর?

বাইরে একটি অষ্টবর্ষীয় ছেলে দাঁড়িয়ে। হাতে গজাননের চিঠি। লিখেছে, জিপ নিয়ে যেন তাড়াতাড়ি আসে যশোবন্ত। প্রসব ব্যথা বেড়েছে রূপালির! দরজার সামনেই ট্রেকারটা দাঁড় করানো। আজকাল যশোবন্ত বাড়িতেই চলে আসছে ট্রেকারে, কখন কী দরকার লাগে। তালুকার সদর শহর বলে একটি প্রসূতিগৃহ আছে। সকলে সেখানেই যায়। জটিল কেস হলে জেলা সদর। ওখানে স্বাভাবিক প্রসব ছাড়া অন্য কিছুরই ব্যবস্থা নেই, সাদামাটা সরকারি হাসপাতাল। নার্স, এএনএম কয়েক জন, মাত্র দু'জন ডাক্তার। অক্সিজেন বা রক্ত যদি মাঝপথে দরকার হয়?

রূপালিকে দেখে বুকের রক্ত ছলকে উঠতে গিয়েও স্থির হল। ঘামে ভিজে গেছে শরীর, এই শরতের রাতে। দাঁতে দাঁত চেপে আছে যন্ত্রণায়। খুব কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু একটি সান্ত্বনার কথা বলবে যশোবন্ত তার পথ নেই, স্পর্শ করা তো দূরের কথা— সে এসেছে গাড়ির চালক হয়ে। এই তার কাজ। প্রসূতিগৃহে পৌঁছে জানা গেল লেডি ডাক্তার দু'জনই বাড়িতে। 'কল' পেলে আসবেন। রূপালিকে বেডে শুইয়ে ডাক্তারকে ফোন করল যশোবন্ত। গজানন আছে বটে, তবে তার ভাবভঙ্গি কেমন যেন শিথিল, অনুদ্বিগ্ন। নাকি সে ভাবছে, যশোবন্ত যেহেতু গাড়ি চালিয়ে এসেছে, বাকি সবকিছু সে-ই করবে। হাতচিঠি নিয়ে যে অষ্টবর্ষীয় ছেলেটি (গজাননের ভাইপো) ওকে ডেকে তুলেছিল, সেও আছে। বাড়ির মেয়েরা ছাড়া যশোবন্তের সঙ্গে দৌড়ঝাঁপের উপযুক্ত মানুষ মাত্র একজন। এ অঞ্চলে আজও যেমন যশোবন্তের কিঞ্চিৎ প্রতিপত্তি আছে তখনও ছিল। গাড়ির জন্য সম্ভ্রমও আদায় করে নিত ও, দীর্ঘ চেহারা, ওর ভুমিহার গোঁফ জোড়া, ভালো স্বাস্থ্য সবমিলিয়ে। লেডি ডাক্তারের বাড়ি শহরের অন্য প্রান্তে। এখনই আসছি, তৈরি থাকুন, বলে তুফানের মতো তাঁকে ট্রেকারে তুলে নিয়ে এল যশোবন্ত। রূপালির গোঙানির শব্দ ভেসে আসছে প্রসূতি সদনের করিডরে। ওর কি খুব কষ্ট হচ্ছে, হে ভগবান? কী হবে যদি প্রসব আটকে যায়? কারও কারও অপারেশন করতে হয় শিশুকে বার করতে গিয়ে। তেমন কিছু হলে, কোনও ভয় নেই রূপালি। আমি তোমাকে গাড়িতে বসিয়ে নিয়ে যাব জেলা সদর। যতদূরের পথই হোক। যত কঠিন হোক না সে পথ।

যশোবন্তের তো পরিবারের কেউ নয়। লেবার রুমের ধারেকাছে তাকে আসতে দেবে না নার্সরা। কিছুটা দূরে করিডরের বাঁকে একটা খালি চেয়ার দেখে সেখানে বসল যশোবন্ত আর তার এতদিনের নাস্তিকতাকে দু'হাতে ঠেলে সরিয়ে বিড় বিড় করে বলতে থাকল নানারকম প্রার্থনা: হে ভগবান, হে পারলি বিশ্বনাথ, হে দেবী অম্বা, প্রভু যিশু, হে আল্লাহ্, রূপালির জীবন যেন সংকটে না পড়ে, প্রসব যেন নিরাপদে হয়! মনে পড়ল, বাবা তাকে সঙ্গে নিয়ে হনুমান চালিসা পড়তেন, রামরক্ষা স্তোত্র, অনিচ্ছুক কিশোর সেসব আউড়ে যেত। এখন দেখছে, সবই মনে আছে তার, কিছুই ভোলেনি যশোবন্ত, সে সবও মনে মনে পড়ে নিল দু'বার করে!

আঃ আঙ্গি, আঙ্গি, আঙ্গি, আর আমি পারছি না, আমি আর বাঁচব না গো... রূপালির অশ্রুহীন আর্তচিৎকার ভেসে আসছে আধো-অন্ধকারে। ওর মা হাসপাতালে আসেননি। এটা এখানকার দস্তুর নয়। মেয়ের বাপের বাড়িতে খবর যা যাবার যাবে আগামীকাল। আচ্ছা, বশোবন্ত গিয়ে রূপালির মাকে নিয়ে আসে যদি? মেয়েটা নিজের মাকে দেখতে পেলে হয়তো বল পাবে শরীরে। মায়ের মতো কি আর কিছু?

নাঃ বশোবন্ত কোথাও যাবে না। ঘাটি গেড়ে বসে থাকবে এখানে। যদি রূপালি তাকে দেখতে চায়? দেখতে চাইলে কি দেবে ওরা? ছাড়বে না বশোবন্তকে ঘরের ভিতর! আচ্ছা এত সময় লাগে এক শিশুর মায়ের শরীর থেকে বেরিয়ে পৃথিবীর মাটিতে পৌঁছতে? যেন দীর্ঘ দীর্ঘ কত রাত ধরে ওখানেই বসে বশোবন্ত রূপালির আর্ত চিৎকার শুনে যাচ্ছে। আর তো সে পারে না। চেয়ার থেকে উঠে দীর্ঘ পদচারণা করতে থাকে খাঁচায় বন্দি বাঘের মতন। একসময় রাতের আকাশ যেন অলৌকিক তরবারিতে চিরে শিশুর কান্না জেগে ওঠে। মায়ের গলা আর শোনা যায় না। শিশু কাঁদছে, আনন্দ, বেদনা, আত্মআবিষ্কারের দ্রোহ সব মিশিয়ে সে ঘোষণা করছে নিজের আগমন বার্তা। প্রসূতি বোধহয় ক্লান্ত হয়ে এলিয়ে পড়েছে, তার দেহে আর কাঁদারও শক্তি নেই!

চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল পড়ছে বশোবন্তের, আপনা থেকেই। না জানি সন্তানের পিতার কী মনের অবস্থা হয় এ সময় সে ভাবছে! নানা অলীক বাস্তব দেবদেবীর থানে কল্পনায় মাথা ঠেকাচ্ছে বশোবন্ত, নারকোল ভাঙছে ধূপ জ্বালছে।

চোখে বোধহয় ঘুম এসে গেছিল কিছুক্ষণের জন্য, বসে বসেই। হঠাৎ জেগে মনে হল স্তব্ধ চারদিক। নিঃঝুম করিডর। রূপালির কোনও সাড়া-শব্দ নেই, ও বেঁচে আছে তো? আর সেই শিশু? আকাশ চিরে কাঁদছিল যে এতক্ষণ, সেও কি ঘুমিয়ে পড়ল? প্রথম মায়ের দুধ পেয়ে তৃপ্ত, শান্ত হয়ে গেল?

বশোবন্ত খেয়াল করল, রূপালির শ্বশুরবাড়ির কেউ তার ধারেকাছে নেই। সন্তান জন্মের খবর দিতেও এদিকে আসেনি গজানন পাতিল। আসবে কেন, কাজ যা ওঠানোর ছিল বশোবন্তের থেকে, তা তো হয়েই গেছে! মনটা তেতো হয়ে গেল তার। অথচ উৎকর্ণ হয়েই আছে সে, স্তব্ধ রাতের বুকে গাছের পাতাটি পড়লে যেন তার কান এড়াবে না, যেন সে বুঝতে পারছে, তার একাকিত্বের গহনে ঘটে চলেছে বিপুল এক মন্থন, স্নায়ু টান টান করে উদ্রীব হয়ে না থাকলে, কোনও ত্রুটি হয়ে যেতে পারে তার প্রহরায়! আসলে, সত্যিই তো গজাননকে বিশ্বাস করতে পারেনি বশোবন্ত। মানুষটির মধ্যে কোথাও একটা নিষ্পৃহ নিষ্ঠুরতা আছে, যা কেবল ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় দিয়েই বোঝা যায়। রূপালিকে বিয়ে করেছে বটে, রূপালির জন্য ওর মনপ্রাণ যে ব্যাকুল নয়, আজ রাতের উদ্বেগভরা ছোটাছুটির মধ্যে ওর স্থবিরতা দেখেই আন্দাজ করেছে বশোবন্ত।

কোথাও কি শিশুর কান্না শোনা গেল? কান খাড়া হল বশোবন্তের। দূরে, কোনও অস্ফুট গোঙানির মতো— হয়তো শিশু নয়, রাতে তো ক্ষুধার্ত বেড়ালেরা ঘুরে বেড়ায় প্রসূতি গৃহের আশপাশের জমিতে। ক্ষুধার্ত বেড়ালের কথা মনে হতেই উঠে দাঁড়াল বশোবন্ত। কেবল বেড়াল কেন? শেয়াল, কুকুর— এরাও তো রাতে ঘুরে বেড়ায়। খাবার খোঁজে। হাসপাতালের করিডরে আলো থাকলেও বাইরের হাতায় তেমন আলো নেই। আকাটা ঘাস, গাছ-গাছড়া, আগাছা বেড়ে উঠেছে এবারের বর্ষার জল পেয়ে, দিনমানে যেতে আসতে দেখেছে যশোবন্ত। শহরের মাঝখানে নয়, প্রান্তসীমায় এই পুরনো প্রসূতি ঘর। এখনও বাইরে অনেকটা খোলামেলা জমি— অন্ধকারে তাতে কী চলে বেড়ায় কে জানে?

দাঁড়িয়ে উঠল বশোবন্ত। করিডর দিয়ে ভিতরের দিকে না গিয়ে সামনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে। তারপর আন্দাজ করে হাঁটতে লাগল পিছনের দিকে, রূপালির ডেলিভারি রুমের দিকটা যেখানে। মাটি শুকনো, তবে গাছ-গাছড়ায় ভরা, অন্ধকার। অষ্টমীর চাঁদ কি আর পূর্ণিমার চাঁদের মতন তেজ দেখাবে? শিশুর গুমরানো কান্না ভেসে আসছে একটা ঝোপের মধ্যে থেকে— বুকের মধ্যে দপ্ দপ্ করছে নিজের হৃদস্পন্দন। বশোবন্তের মনে পড়ে কাপড় জড়ানো পোঁটলাটা দ্রুত বুকে তুলে নিয়ে সে দেখছে— দমবন্ধ হয়ে গেছে? মারা গেছে? জানলা থেকে বাতাস পাওয়ার সব পথ বন্ধ করে ওকে যে ছুঁড়ে ফেলেছে, সে নিশ্চিন্ত এতক্ষণে নিশ্চয়ই মারা গেছে ওই মেয়ে, নইলে হাসপাতালের হাতায় চড়া শেয়াল-কুকুররাই টেনে নিয়ে যাবে তাকে! প্যাচপ্যাচি কীভাবে জড়িয়েছে কাঁথা কাপড়, দেখ, হে ভগবান, আর একবার ডাকি, তুমি বাঁচিয়ে রাখ ওকে! বাঁধন খুলে ওকে বুকের কাছে ধরতে নড়ে উঠল নবজাতক, বুকে হাত বোলাতে নিঃশ্বাস স্বাভাবিক হল তার। স্পষ্ট ফুটে উঠল কান্নার আওয়াজ!

এবার আর বশোবন্তকে ঠেকানোর মতো কেউ ছিল না। সোজা রূপালির বেডের কাছে গিয়ে তাকে ঠেলে তুলল ঘুম থেকে। রূপালি অসাড়, নিষ্পলক চেয়ে আছে! গজানন ভুরু কুঁচকে চেয়ে আছে ওর দিকে, রাগে ফুলে ফুলে উঠছে! তুমি খুনি একটা! মেয়ে হয়েছে বলে প্রাণে মারার জন্য জানলা দিয়ে ফেলে এসেছিলে— তাই না? কতক্ষণে বাতাস না পেয়ে মরে— কতক্ষণে শিয়াল-কুকুর ছিঁড়ে খেয়ে নেয়— তোমাকে পুলিসে দেব আমি চলো— চলো থানায়, আমার সঙ্গে এখনি!

কাপুরুষ গজানন ওর পা ধরতে নীচে বসেছে, মেয়েকে বুকে নিয়ে থর থর করে কাঁপছে রূপালি, কাঁদছে।

এবারের মতো মাফ করে দাও বশোবন্ত, ভুল হয়ে গেছে— মেয়েসন্তান মানুষ করা কী ব্যাপার আমাদের সমাজে তুমি তো জানো...

আমি জানি, এই মেয়ে আমার। এর নাম দুর্গা। দুর্গা অষ্টমীর রাতে ওর জন্ম। আজ থেকে ওর জীবনের ওপর কোনও হক থাকল না তোমার! এলেম যদি না থাকে, আমাকে দাও, একা ওকে বড় করে দেখাচ্ছি... এফআইআর করে রাখছি এখনই— তুমি পাও হয়ে ওকে মারতে চাও— যদি কোনও বেচাল আবার দেখি, নিজেই এসে মেয়ে তুলে নিয়ে যাব—

রূপালি নিঃসাড়ে কাঁদছে। মেয়ের চিৎকার গর্জন হয়ে আবার ফালা ফালা করছে রাত আকাশ। ওকে দুধ দিতে হবে। বশোবন্ত গজানন বেরিয়ে গেল রূপালির বেডের পাশ ছেড়ে।

এই তার মেয়ে দুর্গা। ওর জন্মদিন দুর্গা অষ্টমীর ভোর রাতে। পৌষ মাসের মাঝামাঝি ওর বিয়ে!

দুর্গার ষোলো বছর বয়সে তার জন্মদাতা বাবা গজাননের মৃত্যু। ওই ষোলোটা বছর রূপালিদের বাড়ির ভিতরে ঢোকেনি বশোবন্ত, কিন্তু জানান দিয়েছে নিজের উপস্থিতি। বাড়ির সামনে দাঁড়িয়েছে, পুরনো ট্রেকার জিপ নিয়ে ঘোরাঘুরি করেছে, লোক মারফত খবরাখবর নিয়েছে, গজানন জানুক, বশোবন্ত নজর রেখেছে মেয়ের ওপর!

রূপালি অনুযোগ করেছে। বৈধব্যের পর তার ও বশোবন্তের দেখাসাক্ষাৎ কিশোরবেলার মতো সহজ হয়ে এলে—

তুমি ওকে ধমকাচ্ছিলে, হাসপাতালের ভিতর, মানুষ করার এলেম না থাকলে, তুলে নিয়ে যাব! মানে দুই পুরুষের লড়াই এটা! আমি মা, আমার কোনও মত নেই, কোনও ক্ষমতা নেই!

—ক্ষমা করো, রূপালি! তখন রাগে আমি কাণ্ডজ্ঞান হারিয়েছিলাম তুমি কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছিলে, সেই সুযোগে এই কাণ্ড যে ঘটাতে পারে, সে তাহলে কবে থেকে সমস্ত কিছু ছকে রেখেছে, ভেবেই আমার মাথা ঠিক থাকছিল না। মেয়েকে তো তুমিই বড় করেছ, এত সুন্দর করে, আমি তো কেবল

বাইরের পাহারাদার!

দয়ার বাড়িতে বসে, কয়েকবার শিরুর কাসার থেকে যাওয়া-আসার পর, হৃদ্যতা ও পারস্পরিক বিশ্বাস অনেকটা বেড়ে গেলে, যশোবন্ত এই রাতের ঘটনাটা শুনিয়েছিল দয়াকে। দেখুন, আজও আমার গায়ে কাঁটা দেয়! আমি এই মেয়ের বাবা নই তো কে? গজানন পাতিল? আপশোস রয়ে গেল লোকটাকে পুলিসে দিতে পারলাম না। এমন হাউমাউ কান্না জুড়ে দিল যে হাসপাতালের স্টাফ সব এসে হাজির ওর হয়ে পৈরবী করতে—

আমাদের বিহারে, রাজস্থানেও শুনেছি, মেয়ে হলে মুখে নুন দিয়ে দেয়। মেয়েদের মারার কত যে তরিকা। হাজারিবাগের ওদিকে কুলঙ্গির উপর নতুন বাচ্চাকে রেখে নীচে মালসায় তেজ আগুন জ্বালিয়ে দেয়। তাপের আঁচে ছটফট করে মরে যায় মেয়েটা। মুখে দুধের বাটি পুরো ঢেলে দেয় কোথাও কোথাও যতক্ষণ না দমবন্ধ হয়। গজানন জানালা দিয়ে ফেলে দিয়েছিল— হয় দমবন্ধ হোক না হয় শিয়াল-কুকুরের মুখে যাক। এইসব বদমাশগুলোর বাপ হতে শখ— কিন্তু মেয়ের বাপ হবে না। তবু তো তখনও আপনাদের সেন্ট্রাল আইন আসেনি— আইন আসার পর হালত আরও বিগড়েছে। আগে বাপ-মা কি দাই মেরে দিত জন্মের পর, এখন নতুন নতুন মেশিন এসেছে, টেস্ট হচ্ছে, পোর্টেবল মেশিনও, পড়লিখা স্মার্ট ডাক্তারবাবু আর ম্যাডামরা জন্মের আগে শয়ে শয়ে মেয়েকে খালাস করে দিচ্ছে। আমরা এগচ্ছি না পিছোচ্ছি ম্যাডাম?

—মেয়েরা এগচ্ছে, তাই পেছন থেকে চাপ আসছে যশোবন্ত। মেয়েদের এগতে দিলে তো শাসনের তারিকা বদলে যাবে, ঘর গেরস্থালির নিয়ম পাল্টে যাবে, সব ওলট পালট হয়ে যাবে— তাই আক্রমণের ঢেউ আসছে একের পর এক— কিন্তু এও চিরকাল রইবে না যশোবন্ত, হয়তো নতুন নতুন টেকনিক আর স্ট্র্যাটেজি আনবে ওরা, কিন্তু আমাদের একজোট হয়ে হাটা বন্ধ করতে পারবে না।

—ছোটখাট ডাক্তার দু'একটা গ্রেপ্তার হয়ে জামিন পেয়ে গেছে। মেশিন সিজ হয়েছে। ক্লিনিক বন্ধ হয়েছে। কিন্তু আমরা এখনও মানুষকে বোঝাতে পারিনি, যারা মেয়েদের 'বোঝা' বলে মনে ভাবে, তারা কতদূর নিকম্মা!

—ম্যাডাম, ডাক্তার মঞ্জু পাতিলকে অ্যারেস্ট করাতে পারেন। ও-ই সবচেয়ে খতরনাক জেলার মধ্যে, ও আর ওর আদমির সঙ্গে সবার টিকি বাঁধা। ওকে জেলে না ঢোকালে খুনের প্যাস বন্ধ হবে না।

দাঁড়ান, এই তো সবে শুরু। দয়া বলেছেন।

কেবল স্টিং নয়। আমরা ট্রেনিং-এর কাজ আরম্ভ করেছি। দিল্লি, বম্বেতে আমাদের বন্ধুরা আছেন। ডিএম এসপি জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট পাবলিক প্রসেকিউটর— আইনের এক-একটা করে ধারা আলোচনা করা হয় ট্রেনিংয়ে।

আইনের ধারা নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে, এরপরের একটি দশক। ট্রেনিং হয়েছে। দয়ার কাজ চলেছে গ্রামে, সংগঠন মজবুত হয়েছে। বাল্যবিবাহ এখন কমে এসেছে, তারমধ্যে আগের আস্ফালন নেই। মেয়েরা স্কুলে যাচ্ছে— কিন্তু হাইস্কুলে পৌঁছবার পথ বহু গ্রামে এখনও দুর্গম। বাস রুট নেই। সরকারি বাসও হাইওয়ের একটু ভিতরে ঢুকে ছাত্রীদের নিতে চায় না। ফলে মেয়েরা ক্লাস এইট পাশ করে বসে থাকছে বাড়িতে। ভুলে যাচ্ছে পড়া। এদের নিয়েই দয়ার সবচেয়ে বড় ভাবনা। কোনও না কোনও কাজে এদের জড়িয়ে রাখার জন্য ব্লকের কার্যকর্মগুলির খোঁজখবর রাখতে হয় তাঁকে। ব্লকস্তরের অফিসাররা, তহশিলদাররা সকলেই চিনে গেছেন কাজকর্মে কোনও বাধা পান না দয়া। বরং সহযোগিতা করতে সকলেই উদগ্রীব— যতক্ষণ বৃহত্তর স্বার্থে আঘাত না লাগে। সবচেয়ে মুশকিল, স্কুলগুলিতে পড়াশুনো হয় নামমাত্র। রাজনৈতিক

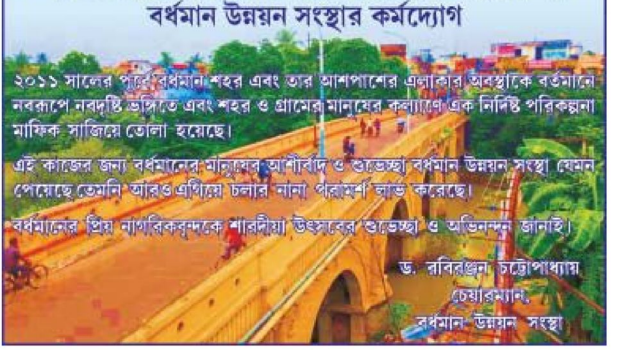

সংগঠন এতটাই শক্তিশালী, যে বেনামী শিক্ষককে বসিয়ে স্থায়ী শিক্ষক চলে যান নিজের কাজে। টোকাটুকি চলে ঢালাও তাও শিক্ষকদেরই উৎসাহে। হবে না কেন? তাঁরা তো জানেন, সারা বছর পড়ানো হয়। ফলে পাশ করে যায় ছেলেমেয়েরা, পাশ তো করাতেই হবে, নইলে তারা কী করবে— কিন্তু নব্বই শতাংশ নম্বর পেয়ে প্রায় নবসাঙ্কর যোগ্যতা নিয়ে বেরয় তারা। দূরের স্কুলে যেখানে মেয়েরা পথের অভাবে, বাসের অভাবে পৌঁছতে পারে না, সেখানে আজকাল এক নতুন পদ্ধতি হয়েছে। স্কুলে নাম লিখিয়ে বাড়ি বসে পড়াশুনো করো, শেষকালে এসে ফাইনাল পরীক্ষা দাও। শিক্ষকদের কাজ সোজা হয়ে যায় এতে, তাদের আর্থিক লাভও বাড়ে। গণ টোকাটুকির মাধ্যমে ফাইনাল পরীক্ষা সারা হয়ে যায়। পরিদর্শকরা নির্বাক দর্শক। পাশ করে সার্টিফিকেট নিয়ে বেরনো এইসব মেয়েদের কী কাজে লাগাবেন বুঝতে পারেন না দয়া অথচ এই ব্যবস্থায় সকলেই সন্তুষ্ট— ছাত্র-ছাত্রী অভিভাবক শিক্ষক পরিদর্শক। কেবল দয়ার কেন মাথাব্যথা? মঞ্জু ও বৃন্দাবন পাতিলের বিরুদ্ধে এখনও কোনও এফআইআরই দর্জ করা যায়নি, আটচা স্টিং অপারেশন-এর পর। জেলা মনিটরিং কমিটিতে দয়া আর নেই। তাঁর টার্ম শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু তিনি স্পষ্ট বুঝতে পারেন, তাঁর টানা অভিযানের জেদ অস্বস্তিতে রেখেছে সকলকেই। জেলার মধ্যে এঁরাই সবচেয়ে বড়, প্রতিপত্তি এঁদেরই সবচেয়ে বেশি, যেহেতু নানা ধরনের মানুষ বিরাট সংখ্যায় জড়িয়ে আছে এই হাসপাতালের সঙ্গে। আজকাল প্রবেশে এতটাই কড়াকড়ি যে মোবাইল ফোনও ছাড়া হয় না ভিতরে। হাসপাতালের বাইরে যতই উঁকিঝুঁকি মারুক তরুণ সংবাদলোভী সাংবাদিকরা, খবরের ছিটেফোঁটাও বাইরে আসে না। অথচ রোজই খসে খসে যায় অজস্র জীবন্ত শিশুকন্যার ভ্রূণ। পুলিস ওখানে ঢুকতে রাজিই হয় না। কারণ তাদের মতে উপযুক্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ ছাড়া ভিতরে ঢুকলে তাদেরই বিড়ম্বনা।

যিনি একদা দয়াকে জেলা মনিটরিং কমিটিতে এনেছিলেন তিনি গত হয়েছেন। এখনকার নতুন জেলা মন্ত্রীর সঙ্গে মঞ্জু ও বৃন্দাবনের সখ্য গভীর। এসব খবরের স্পিনটাল জোগায় যশোবন্তই। কিন্তু আজকাল এগুলি জমাই হয় দয়ার ফাইলে, কোনও কাজে আসে না।

ভিতরে যে অমোঘ ক্লান্তি জমে উঠেছে দয়ার, তার একটা বড় কারণ এই যে হাতুড়িটা ঠিক জায়গায় না মারতে পারার ব্যর্থতা। যশোবন্ত যা বলেছিল প্রথম দিনেই, তাঁর কর্তব্যের দিক নির্দেশ হিসেবে। কে জানে যশোবন্ত হয়তো মনে করে, দয়ার কাজের তোড়জোড় যত, ফল তার এক শতাংশও নয়। এসব কাজে সময় লাগে, কখনও কয়েক প্রজন্ম লেগে যায়। দয়ার পর অরণ্যা, তারপর অরণ্যার পুত্র-কন্যা— সেই সময়ে যদি সমাজ বদলায়! আইন এসে যায়, কারণ আইনের প্রেক্ষাপটে থাকে আদর্শ সমাজ ভাবনা, কিন্তু সমাজ চলেছে অতি ধীরে খুঁড়িয়ে, বুকে হেঁটে রক্ত পায়ে.... তাকে টেনে ধরছে নানা বাস্তব, অর্থনীতি, রাজনীতির গহন যড়যন্ত্র...

সেদিন কার্টে বোমা ফেটেছিল। কেন ফেটেছিল, এ নিয়ে পুলিস তদন্ত হয়নি। সেদিনের আক্রমণ ছিল দয়ারই জন্য, অরণ্যাকে হত বা আহত করে। বলবীরকে দয়া আর রাখতে পারেননি। ওর পায়ে চোট লাগা এবং তারপর একেবারেই না পৌঁছনো স্বস্তিজনক ছিল না দয়ার পক্ষে। অথচ বলবীর ঘরের অনেক কথাই জানে— যেহেতু নিয়মিত অরণ্যাকে নিয়ে গাড়ি চালিয়ে কোর্টে যেত সে। কী যে বিপদ! অভিজিৎ তাঁর কিছু সোর্স মারফৎ বলবীরের গতিবিধির ওপর নজর রাখছেন। এখন অটোমোবাইল সংস্থা থেকে বদলে বদলে ড্রাইভার রাখা হচ্ছে ডেলি ওয়েজে। অরণ্যা এতে খুব কৌতুক বোধ করে— ঠাট্টা-তামাশার বিষয় এটা— ওর আর দীপকের মধ্যে। দীপকও উদিগ্ন— কিন্তু অরণ্যার কাছে সেটা ভাঙতে চায় না ও। ও-ও সমানে হাসাহসি করে যায় বইরে।

একটা পরিবার বসে আছে আয়েয়গিরির ওপর। মুখে সবার সঙ্গে সহজ সম্পর্ক— কিন্তু সাতারা থেকে সাড়ে তিনশো মাইল দূরের এক জেলার প্রায় প্রতিটি শ্রেণীকে বিচ্ছিন্ন ও ক্রুদ্ধ করে রেখেছে দয়ার কাজকর্ম। শিক্ষক-শিক্ষিকা, হাসপাতাল, মারণ যজ্ঞে নিয়োজিত ডাক্তার-নার্স, রেডিওলজিস্ট, জেলা প্রশাসন, কোর্ট, পুলিস সবাই। এই আপাত নিস্পৃহ বিরুদ্ধাচরণ ওখানে গেলেই সারা দেহে অনুভব করা যায়। এতটাই স্পষ্ট।

বাকি রইল কেবল জন্মাতে পারা, বেড়ে ওঠা মেয়েরা। এরা কোনওদিন দয়ার পাশ ছেড়ে যাবে না।

যশোবন্ত মাঝখানে খবর এনেছিল— এমন খবর যা যাচাই করার কোনও উপায় নেই। কুকুররা নাকি আর খেয়ে কুলিয়ে উঠতে পারছে না, তাই মঞ্জু আর বৃন্দাবন দক্ষিণের এক চোরাশিকারি দল মারফত নরমাংসেরও কুমির আনাচ্ছেন। ফাস্টার এবং বিগার রেট অব ডিসপোজাল। শুনে হেসে উঠেছিলেন দয়া! একই সঙ্গে মনে হয়েছিল, কল্পনা, যদিই বা এ কাল্পনিক রটনা হয়, হয়তো বাস্তবের করাল ক্রোশ দূরেই আছে! অসম্ভব নয়।

দশহরার পর কাজে মুহুই যেতে হয়েছিল দয়াকে। সাতারা থেকে ঘণ্টা ছয়েক উল্টোদিকে, কিছু কাজ ছিল মন্ত্রণালয়ে। কর্মশালা করতে হবে, তার জন্য কিছু গ্লান্টও দরকার, নানা জায়গায় যাওয়া। সঙ্গে দীপক এসেছে গাড়ি চালিয়ে, শহরেও নানা জায়গায় যাওয়ার দরকার।

তৃতীয় দিন ভোর ভোর যশোবন্তের ফোন এল। গতরাতে পরপর দু'জন গর্ভবতী মেয়ে মারা গেছে, মঞ্জু পাতিলের ক্লিনিকে। কন্যাভ্রূণ পাওয়া গিয়েছিল আলট্রাসোনোগ্রাফিতে। তারপর দুই পরিবারই দুই তরুণী বধূকে তুলে দেয় মঞ্জু পাতিলের কখনও না নেভা চিতায়। তারা আর ফেরেনি!

—আমাকে বলে কী হবে যশোবন্ত? রিক্ত গলায় দয়া বললেন। আমি কী করব? জেলাশাসন বলবে, সাক্ষ্য-প্রমাণ নেই, গর্ভপাত কেন হয়েছিল, তাছাড়া পরিবার তো বন্ডে সই করেইছে, হাসপাতালের কোনও দায় নেই!

—আমার কাছে খবর আছে, একটা কেসে সময় পার হয়ে গেছিল গর্ভপাতের, অন্যটাতে খুব দুর্বল, অ্যানিমিক ছিল মা-টি... আপনি কিছু করবেন না দয়া!

—আমি কিছু ভাবতে পারছি না যশোবন্ত।

— ভাবুন না দয়া। ম্যাডাম না হলে নাম ধরে ডাকছে কেন যশোবন্ত? ও কি কোথাও টান দিতে চাইছে দয়ার সত্তা ধরে।

—আপনি তো বলেছিলেন, যেকোনও সময় ফোন করলে দু'হাজার মেয়ে ছুটে আসবে। তাদের ডাকুন! এ কী অসম্ভব কথা বলছে যশোবন্ত! কোথায় সাতশো কিলোমিটার দূর মারাঠওয়াড়া— কোথায় দয়া! কে করবে এত ফোন!

দীপক পাশে দাঁড়িয়েছিল। ইশারায় চেয়ে নিল ফোনটা। যশোবন্তকে বলল— আমি দয়া তাঁইকে হেল্প করব। আমরা ডাকব। যত মেয়েকে সম্ভব। আপনি কী করবেন যশোবন্ত! এতদিন যত খবর দিয়েছেন, তার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ! এবার কিছু বেশি করার সময় আসেনি কি?

হ্যাঁ, যশোবন্ত গদ্গদভাবে বলল, আমি ডাকছি ছেলেদের। সাগরের মতো কাটাই মজদুর আর তাদের বন্ধুরা, আমার চেনা ড্রাইভার ক্লিনার খালাসি দোকানদার— আমার কাছেও আছে দুশোর বেশি নম্বর। যাদের আমি এসএমএস করি, টাচে থাকি রেগুলার। ছেলে ও মেয়েদের এবার একজোট করার সময় এসেছে।

অদ্ভুত মানুষ!

ফেরা আরম্ভ হল মারাঠওয়াড়ার দিকে। দীপক তুফানের মতো

গাড়ি চালাচ্ছে। গলায় তার সেই সমতার গান— যা গাওয়া হয় গ্রুপ মিটিংয়ে। ডাক্ষণি বাজিয়ে মেয়েদের সঙ্গে দীপক গায় তার উদার গলায়—

'তু য়াবো; তু য়াবো! বন্ধন তোড়িত য়াবো!''

তুমি এসো! তুমি এসো! বন্ধন ছিঁড়ে বেরিয়ে এসো!

সাম্যের পথ ধরে বাজিয়ে এসো তোমার পায়ের মঞ্জীর!

''অন্যায়ের বিরুদ্ধে আজ বদ্ধ হোক হাতের মুঠি

এখানে ঈগলের বিরুদ্ধে জোট বেঁধেছে চড়াই-এর শক্তি

এই যুদ্ধভূমি থেকে তুলে নাও রক্তচন্দনের টিকা... এসো, তুমি এসো...''

দয়ার আঙুল ফোনে।

এর মধ্যে সঞ্জয়ের ফোন এসে গেছে দু'বার।

ওকে বলা হয়েছে ডাক্তার কৌশল্যা, সাগর-মিনু, ইন্দুমতী সাহু সবাইকে বলতে, তিরিশ-চল্লিশটা করে ফোন করবে সবাই। বেলা বারোটার ভিতর হাসপাতাল অবরোধ। তার ভিতর পৌঁছে যাবেন দয়া আর দীপক। মেয়েরা, সাংবাদিক, অন্য সংস্কৃতি কর্মীরা আসবেন নানা দিক থেকে। যার যা গাড়ি লাগে বুক করে নিতে হবে তখুনি। সঞ্জয় সাংবাদিকদের খবর দিচ্ছে। অরণ্যা তরুণ আইনজীবীদের— দুই জেলারই। অভিজিৎ সংযোগ করছেন তাঁর অধ্যাপক বন্ধুদের সঙ্গে। জেলার একদল শিল্পী আঁকছে পোস্টার ফেস্টুন! বেলা বারোটার সময় হাসপাতাল ঘিরে জনসমুদ্র। স্লোগান, বিক্ষোভ, ভিডিও রেকর্ডিং। দয়া বসলেন, পাশে অরণ্যা আর দীপক। এবার আর উঠবেন না, যতক্ষণ না গ্রেপ্তার হচ্ছেন মঞ্জু পাতিল। ডিএমকে ফোনে জানিয়েছেন, যদি এখনও পুলিশ হাসপাতালে ঢুকে তদন্ত না করে, প্রেস কনফারেন্স ডেকে তাঁর আর এসপি'র নামে অভিযোগ করবেন দয়া। দয়ার এক অন্য সহোরক মূর্তি। রোজকার ভদ্রতা বিনিময় আর সম্পর্ক রক্ষার খাতিরে যে মূর্তি ধূলিধূসর হয়ে ঢাকা পড়েছিল।

এ জেলায় জনাপাঁচেক ডিএম দেখেছেন দয়া, তাঁর আন্দোলন পর্বে। প্রথম চারজনই বয়স্ক, পাশের দরজা দিয়ে প্রমোশন পেয়ে অবসর নেবার ঠিক আগে জেলার চেয়ারে বসেছেন। ভাগ্যক্রমে পঞ্চম জেলাশাসক, একজন তরুণ আইএএস। যদিও তিনিও এতদিন নিজের উদ্যোগে তদন্ত বা অভিযান চালানোর কাজটি হাতে নিতে চাননি। চাকরির আরম্ভে দ্রুত বদলি হয়ে যাওয়া কোনও বুদ্ধির কাজ নয়। তবে হাসপাতাল অবরোধের চেহারা ও সমবেত নারী-পুরুষের মধ্যে ক্ষোভ আন্দাজ করে এগিয়ে এলেন তিনি। সঙ্গে এসপি। একী ম্যাডাম! আপনি বসে কেন! উঠুন, আমরা এখনই হাসপাতাল লিস করার ব্যবস্থা করছি। আমাদের ফোর্স ভিতরে ঢুকে গেছে অললরেডি!

দয়া মাটিতে বসেই উপরে তাকালেন। যাত্রার ক্লান্তি তাঁর চোখে-মুখে, খিদে-তেষ্টা এই মুহূর্তে মনে কোনও ছায়া ফেলছে না। যেন পাথরের তৈরি এক মূর্তি। না, আমি আর উঠব না। উঠবে আমার লাশ, যদি জানিন অযোগ্য ধারায় গ্রেপ্তার না হন বৃন্দাবন আর মঞ্জু পাতিল। কন্যাভ্রূণ পরীক্ষা ও নিষ্কাশন সম্বন্ধী আইনের সঙ্গে জুড়তে হবে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে হত্যার চার্জ। এবার আর আমাদের হঠাতে পারবেন না। কেউ উঠবে না এখান থেকে! দয়ার কথা স্পষ্ট শুনতে পেল না ভিড়, কিন্তু তাদের বুকের ভিতর থেকে হুঙ্কার উঠল। ভাঙচুর নয়, ইট পাটকেল নয়, সম্পূর্ণ অহিংস সত্যাগ্রহ।

অক্টোবরের শেষ থেকে ডিসেম্বরের গোড়া। নিজের আইনজীবীর গাউন পরে নিলেন দয়া। অনেকদিন কোর্টে যাওয়া হয় না। আইনের ধারাগুলি ঝালিয়ে নিতে হবে। নিম্ন আদালতে জামিন খারিজ হল মঞ্জু ও বৃন্দাবন পাতিলের। সঙ্গে সঙ্গে হাইকোর্টে গেল ডাক্তার দম্পতি। হাইকোর্টে জামিনের বিরোধিতা করল সরকার পক্ষ। মুম্বই-এর বড় বড় উকিল যাঁরা এই কেস নিয়ে আগ্রহী, পরোক্ষ চাপ জারি রাখলেন সরকার পক্ষের ওপর। কোর্টে বসে থাকতেন দয়া, তাঁর দলবল নিয়ে। সুপ্রিম কোর্টেও জামিন খারিজ হল। সেখানেও দয়া ও তাঁর দল। দয়ার নিঃশব্দ ক্যাম্পেন রাজ্য সরকারের ওপর, সুপ্রিম কোর্টের গুরুত্বপূর্ণ আইনজীবীদের নৈতিক সমর্থন তাঁর সঙ্গে। জামিন খারিজ হওয়ায় ডাক্তার দম্পতি জেলে ফিরে গেলে অনেকদিন পর নিশ্চিন্ত মনে শ্রান্তিহীন ঘুমোতে গেলেন দয়া। অরণ্যা, অভিজিৎ এদের দিকে তাকানোর সময় ছিল না এ ক'মাস। প্রমীলা রান্নাঘর সামলেছে, বাড়ির অবস্থা সুনামির পরের সমুদ্রকূলের মতন। উথাল-পাথাল ঝড় বয়ে গেছে ঘরকরনার ওপর!

তবে এখন সামনে আনন্দের সময়। সামনের পরের সপ্তাহে দুর্গার বিয়ে। যশোবন্তের আর রূপালির মেয়ে দুর্গা। এতে দয়ার পরিশ্রম নেই, দায়িত্ব নেই, সব সামলাবে যশোবন্ত, তাঁদের শুধু নিমন্ত্রিত অতিথি হয়ে যাওয়া।

কয়েকদিন পরই মুম্বই-এর মন্ত্রণালয় থেকে খবরটা এল। নারীশক্তি জাতীয় পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছেন দয়া। এই শনিবারের পরের শনিবার পুরস্কার অনুষ্ঠান। এত তাড়াতাড়ি কীভাবে তাঁর মনোনয়ন হল বুঝতে না পেরে একটু চকিত ছিলেন দয়া। জেলার মন্ত্রী অনিরুদ্ধ রাঠোরের ফোন এল। একদা একাধিক চিনি সমবায় কারখানার প্রেসিডেন্ট ছিলেন, এমএলএ হয়ে সেগুলি ছেড়েছেন। এখন মন্ত্রিত্বেই তাঁর মূল্যবান সময় কাটে।

—কি খুশি তো? দয়া! মনোনয়ন পাঠাতে কিছু দেরি হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু আমিই বললাম কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে, এত কাজের পর যদি দিয়েও আমরা সম্মানিত না করি তবে কীসের পুরস্কার অনুষ্ঠান! অন্তর্বর্তী বিশ্লেষণে পাওয়া গেছে বিড জেলার কন্যাসন্তানের আনুপাতিক সংখ্যা বেড়েছে এই দশ বছরে। এ জেলার কলঙ্ক ঘুচেছে। দেশের মধ্যে সবচেয়ে নীচে তার জায়গা ছিল।

—এতদিন ধরে মেয়েদের সচেতন করার কাজ করেছেন, তারই এই পুরস্কার!

হ্যাঁ, আমিও থাকব পুরস্কার অনুষ্ঠানে। আপনি অবশ্যই আসবেন। সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

—আমি দিল্লি যাব? বড্ড শীত পড়ে এ সময়টা। ভেবেছিলাম দুর্গার বিয়ে পর্যন্ত আর কোথাও দৌড়ঝাঁপ করব না।

—না, না অফকোর্স যাবে!

অভিজিৎ, অরণ্যা, দীপক সব একজোট হয়েছে। যশোবন্ত বলছে, একদিনের তো ব্যাপার, পুরস্কার নিয়ে ফিরে আসুন। আমরা সবাই মিলে এত লড়লাম, আপনারই নেতৃত্বে!

সন্ধেবেলা পুরস্কার অনুষ্ঠানের লাইভ টেলিকাস্ট। সকালে টেলিভিশনটাকে খুলে ঠিকঠাক করছিল দীপক। ওরা তো সিরিয়াল দেখে না। মাঝেমধ্যে খবর। টিভিটা ঠিকঠাক চলা দরকার! জেলার খবরে চোখ পড়তেই দীপক চেঁচিয়ে উঠল, আরে একী!

অতিক্রমণ হঠানোর কাজ চলছে। জাতীয় সড়ক চওড়া করার কাজের টেন্ডার হয়ে গেছে। বেআইনি নির্মাণগুলি ভাঙা হচ্ছে এখন।

—এ তো যশোবন্তের হোটেল!

চারটে বুলডোজার গুঁড়িয়ে দিচ্ছে হোটেলটাকে, চারপাশ থেকে, যেন কোনও পরিকল্পিত যুদ্ধকলা।

অভিজিৎ অরণ্যাও ওর ডাকে টিভির কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। ওদের কপালে ভ্রুকুটি!

—একী হ'ল।

দীপক ফোনে ধরল যশোবন্তকে।

—হ্যাঁ, দীপক, আজ ভোরেই নোটিশ ধরাল শালারা, আর

সকাল ন'টাতেই বুলডোজার চার চারটে। রান্নাঘরের দিকটা আগে ভেঙেছে, যাতে রজিটা তাড়াতাড়ি বন্ধ হয়। এটা নাকি হাইওয়ের জমি! অনেক আগেই নোটিশ দেওয়া আছে? কাকে নোটিশ দিল? কখন? আপের আমলেও তো জানতে পারিনি। তহশিলদারকে ফোন করলাম। উনি বলছেন, কাজটা করছে কেন্দ্রের সড়ক বিভাগ। তাদেরই এক্তিয়ার, উনি কিছু করতে পারবেন না।

তাঁইতে এখন কিছু জানিও না দীপক। একটা কাজে গেছেন। সন্ধেবেলা অনুষ্ঠান। ব্যস্ত হয়ে একে ওকে ফোন করবেন, হয়তো ফিরেও আসতে চাইবেন। দেখি কী করা যায়।

সন্ধের মধ্যে চল্লিশ বছরের পুরনো হোটেলটা যাকে বহু যত্নে, নানা রং ও সংযোজনে সুন্দর করেছিল যশোবন্ত, চারপাশে বানিয়েছিল ফুলের বাগান, গুঁড়িয়ে সপাট সমান হয়ে গেল পৃথিবীর উপরিতলের সঙ্গে। দুই দেশান্তরী বাপ-ছেলের টিকে থাকার লড়াই আর অজাত মেয়েদের বধ করার যড়যন্ত্রের মোকাবিলা করার এক পাওয়ার স্টেশন। বাসনপত্র হাঁড়ি কড়াই বড় কুকার— এগুলো ওরা ভাঙেনি। সে সব কুড়িয়ে চেয়ার টেবিলের নীচে রেখে বিস্ফারিত চোখে দেখছে তিন যুবক— যশোবন্তের শাগরেদ। যশোবন্ত ও দাঁড়িয়ে আছে। মুখে মৃদু ততো হাসি, সিগারেট খেয়ে নীচে ফেলছে একটার পর একটা। ডিএম, এসপি কেউই কিছু জানেন না, জানলেও তাঁরা কিছু করে উঠতে পারবে না। এটা কেন্দ্রীয় বিভাগের সিদ্ধান্ত।

দয়াকে ফোন করলে হতো? নাঃ! তা কিছুতেই হতে দেয়নি যশোবন্ত। সে এতদিন যা করেছে, তার বিরুদ্ধেই এই চারটে বুলডোজার। দয়ার জীবনের আজ এক বিশেষ দিন। এই দিনে তাঁকে অন্য নালিশ জানিয়ে বিব্রত করতে পারবে না যশোবন্ত।

শীতের ভোর। আজকাল কুয়াশার জন্য ভোর ভাঙতে আরও দেরি হয়। চারদিকে অন্ধকার জড়ানো। কুড়ি ফুট দূরের দৃশ্য স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। আকবর রোড ধরে তীব্র গতিতে ছুটছে গাড়িটা। দু'একবার ড্রাইভারকে বলা হয়েছে আস্তে চালাও। দিল্লির হাল ফ্যাশনের চুল ছাঁটা, টিশার্ট, জ্যাকেট, জিনস-এ সাজা ছোকরা সে যেন গা-ই করছে না।

দেরিতে ঘুমিয়েছেন দয়া। বর্ণাঢ্য পুরস্কার অনুষ্ঠান। তারপর ডিনার। বহু জনের সঙ্গে আবার দেখা হওয়া। দেরিতে ঘুমিয়েছেন, উঠেছেন দেরিতে, এখনও চোখের পাতায় ক্লান্তি। অনিরুদ্ধ রাঠোরও ছিলেন। আরও সব কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, এমপিদের সঙ্গে দয়ার আলাপ করিয়ে দিচ্ছিলেন। ফেরার মুখে হঠাৎ বললেন, ওহ্ বলতে ভুলে গেছি! কাল আমার ওখানে চা-ও এসো। কয়েকজনকে বলেছি! ইম্পরট্যান্ট মানুষ।

—কাল তো আমার ফ্লাইট! সাড়ে আটটায়! চায়ে তো যেতে পারব না—

—তাতে কী? সাড়ে ছ'টায় আধঘণ্টার জন্য এসো! ফাইভ ফর্টি ফাইভে তোমাকে পিকআপ করে নেব।

—এত ভোরে চা! দয়া আশ্চর্য হচ্ছেন।

আরে, এ হল দিল্লি! হা হা করে হাসলেন অনিরুদ্ধ। এখানে এনি টাইম ইজ টি টাইম।

মানুষটির কথা ফেলা মুশকিল। বলছেন, পুরস্কার মনোনয়নের পেছনে উনি ছিলেন। পুরস্কারটা অবশ্য দয়া চাননি। তবে পাওয়ার পর মনে হচ্ছে, তিনি একা নন, ইন্দু, মিনু, প্রমীলা, কৌশল্যা ডাক্তার কতজনের হয়েই না তিনি পুরস্কার নিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর হাত থেকে।

এয়ারপোর্টে যাবার জন্য যে গাড়িটার ব্যবস্থা হয়েছিল, সেটা ক্যানসেল করেছেন অত রাতে এসে। ট্রাভেল এজেন্সি ঈষৎ বিরক্ত। এই গাড়িটাই অনিরুদ্ধর বন্ধু এমপি'র ফ্ল্যাটে চা-এর পর বিমানবন্দর পৌঁছে দেবে দয়াকে। গতকাল কিন্তু অরণ্য দীপক অভিজিৎ সবাই কেমন আড়ষ্ট ছিল! খুশি অথচ সংযত। তিনজনের সঙ্গেই কথা বলেছেন, অল্প সময়ের জন্য হলেও, যাতে কারও অসুখ-বিসুখ লুকোতে না পারে এরা! ছোকরা ড্রাইভার একষ্ট্রা স্মার্ট। সকাল পাঁচটা পনেরোয় রিপোর্ট করে দু'বার ফোন করেছে। ম্যাম উঠিয়ে, ফাইভ ফর্টি ফাইভ স্টার্ট করনা হ্যায়। যেন তাড়াটা ওরই। গাড়িতে ওঠার সময় বাঁদিকের দরজাটা পুরো খুলে ধরেছিল এমনভাবে যে দয়া বিরক্ত হয়ে বললেন,

—আমাকে কি এই দিকেই বসতে হবে?

—ওদিকে দরজার লকটা একটু প্রবলেম করছে ম্যাম! আর কিছু নয়।

বাঁদিকেই বসেছেন দয়া, কিন্তু অতি সতর্ক, উৎকর্ণ। বিজন ভোর। গাড়ির ভিতরে লো এসি চলছে। তাতেও শীত যেন বেড়ে গেছে আরও। রাস্তায় জনমানব নেই, গাড়িও না। কুয়াশার মধ্যে দিয়ে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে তাকে, এই অচেনা চালক। অরবিন্দ রোডের ক্রসিয়ে পৌঁছে দয়া হঠাৎ দেখলেন কুয়াশা ভেঙে তিরের মতো ছুটে আসছে একটা সাদা গাড়ি। বাঁদিক থেকে। এত স্পিড— ও কি দেখছে না, সোজা ক্রস করছে দয়াদের গাড়িটা। ফি প্রভাবে বাঁদিক ছেড়ে ডানদিকের দরজার কাছে সরে গেলেন দয়া। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় কোনও বিপদ সংকেত ধরেছে বিদ্যুৎ চমকে। বিকট শব্দ হল একটা! যেন বিস্ফোরণ হল দয়ার কানের কাছে। গাড়ির বাঁদিকটা থেঁতলে, ভিতরে ঢুকে এসেছে— সিটটা ভেঙে গেছে, যেখানে এক লহমা আগে দয়া বসেছিলেন। গাড়িটা স্কিড করে রাস্তার ধারে ফুটপাথে ধাক্কা খেল। যুবক ড্রাইভার স্টিয়ারিংয়ে মাথা রেখে পড়ে আছে, যেন তার ঘুম পেয়েছে খুব। সাদা গাড়িটা অদৃশ্য। ডানদিকের দরজা খুলে গেছে বিপুল ইমপ্যাক্টে। রাস্তায় গড়িয়ে পড়ে ফুটপাথ আঁকড়ে আছেন দয়া।

প্রচণ্ড ব্যথা সারা শরীরে। তেষ্টা। কনুই-হাঁটু সব ছড়ে গেছে। পথের মাঝখানে পড়লে এতক্ষণে পিছন থেকে একটা গাড়ি এসে পিষে দিত। কষ্টে দু'হাতের ভর ফুটপাথে রেখে উঠে দাঁড়ালেন। হ্যাঁ দাঁড়াতে পারছেন। খুব কষ্ট হলেও। বেঁচে আছেন দয়া। গাড়ির খোলা দরজা পথে নিজের ব্যাগ আর মোবাইলটা তুলে নিতে পেরেছেন। এখানে ১০০ নম্বর ডায়াল করলে পিসিআর ভ্যান আসে। দয়াকে এয়ারপোর্ট পৌঁছতে হবে। ফোনে হঠাৎ ঝংকার শোনা গেল। রিং টোন। অনিরুদ্ধ রাঠোর ফোন করছেন। হ্যাঁ, সাড়ে ছ'টাই তো বাজে। ফোনটা সায়লেন্ট করে দিলেন দয়া। তবু কালো স্ক্রিনের উপর সাদা অক্ষরে ফুটে উঠছে বারবার... উৎকণ্ঠা, নাকি কৌতূহল?

অনিরুদ্ধ রাঠোর... অনিরুদ্ধ রাঠোর...

রোদ নেই। সূর্য কোথাও চুপ করে বসে আছে কুয়াশার আড়ালে। তবু ভোর তো এসেছে। পাখিদের শীতার্ত, অর্ধস্ফুট কলকাকলি শোনা যায়।

ফুটপাথের উপর বসে পি.সি.আর ভ্যানের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।

শিকার ও সাক্ষীর দু'জনই নিশানা ছিল। একজন, সাক্ষী হয়তো চলে গেছে, শিকার এখনও জীবিত!

সময় কমে আসছে।

দয়ার জীবনের মেয়াদ খতম করে দেবার সুপারি যারা নিয়েছে, তাদের রেট কমতে থাকবে। তাই ফিরে ফিরে আসবে তারা, ঢেউ-এর মতন। তারই ফাঁকে ফাঁকে জরুরি কাজগুলো সেরে নিতে হবে দয়াকে। কেমন টান টান ছিলার মতন উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছে তাঁর মন, আহত শরীর। এখন আর কোনও ক্লান্তি নেই, ভয় নেই।

অলংকরণ: সুব্রত মাজী

সমাপ্ত